

ছন্দ

ও

অলংকার



गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय
कृपया पुस्तक के ऊपर कोई निशान आदि
न लगायें।

6939

9

पुस्तकालय

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

वर्ग संख्या.....आगत संख्या.....

पुस्तक-वितरण की तिथि नीचे अंकित है । इस तिथि सहित २० वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ जानी चाहिए । अन्यथा १० पैसे के हिसाब से विलम्ब-दण्ड लगेगा ।

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय
कृपया पुस्तक के ऊपर कोई निशान आदि
न लगायें।

6939

DONATION



छन्द ও অলঙ্কার

ডঃ অজয় কুমার চক্রবর্তী

এম এ (ডবল), পিএইচ. ডি., ডি. লিট

CHANDA O ALAMKAR

Written by Dr. Ajay Kumar Chakraborty, M.A. Ph. D , D. Litt,
Rtd. Prof. Cotton College, Guwahati, Assam, 2nd Edition
January 1989.

Price : Rupees twenty only.

প্রকাশক : শ্রীতপন কুমার বিশ্বাস
৪১, অরুণাচল, সোদপদুৰ
উত্তৰ ২৪ পরগণা

পরিবেশক : বীণা লাইব্রেরী, কলেজ হোষ্টেল রোড,
পানবাজার, গোহাটী—১ (আসাম)

মূল্য—২০ টাকা মাত্ৰ

মুদ্রক : বনলতা আর্ট প্রিন্টার্স

আত্মজা

টুকু ও কুমুকে

Forwarded free of cost and with t
Education, Govt. of India New Del

CHANDA O ALAMKAR

Written by Dr. Ajay Kumar Chakraborty, M.A. Ph. D., D. Litt,
Rtd. Prof. Cotton College, Guwahati, Assam, 2nd Edition
January 1989.

Price : Rupees twenty only.

প্রকাশক : শ্রীতপন কুমার বিশ্বাস
৪১, অরুণাচল, সোদপদুর
উত্তর ২৪ পরগণা

পরিবেশক : বীণা লাল
পানবাজ

the complements of the Department
hi.

মূল্য--২০ টাকা মাত্র

মুদ্রক : বনলতা আর্ট প্রিন্টার্স

আত্মজা

টুকু ও কুমুকে

বাবা

ment of

ভূমিকা

আলোচ্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭০ সালে। প্রকাশক ছিলেন ইন্টার্ন বুক এজেন্সী, (কোলকাতা)। বিগত কয়েক বৎসর ধরে বইটি বাজারে আর পাওয়া যাচ্ছিল না। বইটির জন্য তাগিদ পেয়েছি বহু। অপেক্ষা করছিলাম ইন্টার্ন বুক এজেন্সী “ইন্টার্ন এরিয়া”র লেখকের বইটি ছাপেন কিনা। কিন্তু কোন সাড়া না পাওয়াতে প্রকাশনের ভার নিজেই নিলাম এবং বইটিকে কিছুটা ঢেলে সাজালাম—কিছু গ্রহণ ও বর্জন করে।

বিষয় বস্তুটি—

“বিষয়বস্তু বড়ই কঠোর বড়ই নিষ্ঠুর
চেণ্টা করেছি করিতে সরল করিতে মধুর,
যা ছিল অজানা যাঁহা ছিল দূর
করেছি চেণ্টা আনিতে হৃদয়পূর।”

যাদের জন্য চেণ্টা করেছি সেই ছাত্র ছাত্রীরা যদি কিছু উপকৃত হয়—সেটাই হবে পুরস্কার।

তিরস্কার কিছু না কিছু জুটবে। তা রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যেও জুটেছিল—এখনো তার বিরাম নেই। অতএব আমি মাঠে। তবে যাঁরা তিরস্কার করবেন তাঁদের কাছে আমার নিবেদন—রচনা যা পাইনি তার বিচার না করে, যা পেয়েছি তার বিচার। কবি সমালোচক এ্যাবারকম্ব বলেছেন—“Every composition contains within it self the rules by which it should be criticised.”

এই গ্রন্থ রচনায় যাঁদের রচনা থেকে সাহায্য পেয়েছি—তাঁদের নাম ও গ্রন্থনাম “নির্ঘণ্টে” শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছি।

চাঁদের কলঙ্কের মতই কিছু মনুদ্রণ প্রমাদ রয়ে গেছে “শুদ্ধিপত্র” দিয়ে পাঠক-পাঠিকাদের কণ্ঠ দিতে চাইনে।

ইতি—

ডঃ অজয় কুমার চক্রবর্তী

১/১/৮৯

প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

ছন্দ—ছন্দের জন্ম, ভাষা ও ছন্দ, বৈদিক ও সংস্কৃত
 ছন্দ, পালি প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ছন্দ, জয়দেব, ভানুসিংহ,
 চর্যার ছন্দ, বৈষ্ণব পদাবলীর ছন্দ, মধ্যযুগের বাংলা
 ছন্দ, ব্রজবুলি

১—১৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

বাংলা ছন্দের প্রকার ভেদ—অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত,
 অক্ষর, যতি ও ছেদ, চরণ; পর্ব ও পর্বঙ্গ, অসম ছন্দ,
 শুবক, মাত্রা, মাত্রা পদ্ধতি, মাত্রা বিচার

১৪—২৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

বাংলা ছন্দের বৈশিষ্ট্য

২৭—২৮

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা ছন্দ—
 ধামালী, মালঝাঁপ, ভূজঙ্গপ্রয়াত, তৃণক, রামপ্রসাদ,
 মাইকেল মধুসূদন দত্ত

২৯—৩৩

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥

অক্ষরবৃত্ত, পয়ার (তরল, মালঝাঁপ, পর্য্যায়সম, অমিল,
 ভঙ্গ, ঘোল মাত্রা, প্রবহমান পয়ার), শোষণ শক্তি, দ্বিপদী,
 চৌপদী, অমিত্রাক্ষর ছন্দ, গৈরিশ ছন্দ, চতুর্দশপদী
 কবিতা, স্বরবৃত্ত, মৃদুক, মাত্রাবৃত্ত, মাত্রাবৃত্তের বৈশিষ্ট্য,
 মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্তের মধ্যে পার্থক্য, স্বরবৃত্তের সঙ্গে
 মাত্রাবৃত্তের ও অক্ষরবৃত্তের পার্থক্য, সংস্কৃত ছন্দের
 সঙ্গে বাংলা ছন্দের পার্থক্য, মাত্রাবৃত্তের আধুনিক রূপ,
 মাত্রাবৃত্ত ও মৃদুক

৩৪—৫৭

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥

ছন্দের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাথ, গদ্য ছন্দ, পদ্য ছন্দের গদ্য
 কবিতা, বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ, তোটক, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত,
 রুচিরা, পঞ্চামর, মালিনী, শাদুল বিক্রীড়িত ছন্দ, মন্দা
 ক্রান্তা, বাংলাছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান, প্রাকৃত ছন্দ, বৈষ্ণব
 পদাবলীর ছন্দ ও রবীন্দ্রনাথ, ছন্দোলিপি

৫৮—৭৩

অলঙ্কার

সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥

অলঙ্কার, অলঙ্কারের শ্রেণী বিভাগ, শব্দালঙ্কার,
অনুপ্রাস

৮০—৯১

শব্দশ্লেষ, অভঙ্গ শ্লেষ, সভঙ্গ শ্লেষ, পদনরুক্তবদাভাস, যমক,
বক্রোক্তি, অর্থালঙ্কার, সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কার, উপমা
কালিদাসস্যা, উপমা রবীন্দ্রস্যা

৯১—১০০

উপমা, লুপ্তোপমা, মালোপমা, বস্তুপ্রতিবস্তু ভাবের
উপমা, বিম্ব প্রতিবিম্ব ভাবের উপমা, স্মরণোপমা,
রূপক, উল্লেখ, সন্দেহ, উৎপ্রেক্ষা, ভ্রান্তিমান

১০০—১০৯

অপহৃতি, নিশ্চয়, দৃষ্টান্ত, নিদর্শনা, সমাসোক্তি, অতি-
শয়োক্তি, ব্যাতিরেক, প্রতীপ, বিরোধমূলক অলঙ্কার,
বিভাবনা, বিশেষোক্তি, অসঙ্গতি, বিষম, শৃঙ্খলামূলক
অলঙ্কার, গদ্যার্থপ্রতীতিমূলক অলঙ্কার

১১০—১২৫

বাংলায় ব্যবহৃত অপর কয়েকটি অলঙ্কার

১২৬—১২৮

পাশ্চাত্য অলঙ্কার

১২৯—১৩০

অষ্টম পরিচ্ছেদ ॥

মধুসূদনের কবিমানস

১৩১—১৩৯

প্রথম পরিচ্ছেদ

ছন্দ

‘ছন্দ’ শব্দটির মধ্যে রয়েছে—একটি সুরের ঝংকার বা সুরের স্পন্দন।

ভাবের বাহন—ভাষা। এর প্রকাশ ভংগি দুটো—গদ্য আর পদ্য। দুটোর মধ্যে ছন্দ থাকলেও রয়েছে—বিরাট পার্থক্য। এবং এই পার্থক্য—আকৃতি ও প্রকৃতিতে।

আমরা কথা গুলোকে কোন তির্যক ভংগি না দিয়ে যখন সোজাসুজি বলি, তখন আমরা বস্তুব্যবিসয়কে সহজেই বুঝি এবং জানতে পারি—কিন্তু এ বোঝা ও জানা—কানের ভেতর দিয়ে মরমে পশে না এবং আকুল করে না মনপ্রাণ। যেমন : “আকাশে মেঘ গর্জন করিতেছে। বর্ষা চাপিয়া আসিয়াছে। কূলে একা বসিয়া আছি, কোন ভরসা নাই”। এ হচ্ছে নিছক গদ্য। যাহা বা বিরাম চিহ্ন দিয়েও এর ভেতর প্রাণের নিবিড় স্পন্দনটুকু অনুভব করতে পারা যাচ্ছিল না ; কিন্তু কবি যখন ভাষাকে তির্যক ভংগি দিয়ে বললেন—

“গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা

কূলে একা বসে আছি নাই ভরসা”

তখনই অন্তরে জেগে উঠল—স্পন্দন, বইয়ে দিলে সুরের হিল্লোল, দেখা দিল অনিবচনীয়তা—এটাই হ’ল পদ্য, এখানেই পেলাম তার ছন্দ মাধুর্য।

তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—“কথাকে তার জড় ধর্ম থেকে মুক্তি দেবার জন্যই ছন্দ। সেতারে তার বাঁধা থাকে বটে কিন্তু তার থেকে সুর পায় ছাড়া। ছন্দ হচ্ছে সেই তার বাঁধা সেতার, কথার সুরকে সে ছাড়া দিতে থাকে।”

ছন্দ-বদ্ধ বাক্যই কাব্য। এবং সে বাক্য হবে রসায়ক বাক্য। পদ্য সম্বন্ধে জনসন্ বলেছেন—“Poetry, says Johnson, is Netrical Composition. ম্যাকলে (Macaulay) বলেছেন—“We mean the art of employing words in such a manner as to produce illusion on the imagination” একেই কার্লাইন বলেছেন—“Musical thought” রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

“অন্তর হতে আহঁরবচন
 আনন্দ লোক করি বিরচন
 গীতরস ধারা করি সিঞ্জন
 সংসার ধূলিজালে।”

এই “গীতরসধারা”র মধ্যে যে অনিবৰ্চনীয়তাটুকু রয়েছে—তারই মাঝে রয়েছে—ছন্দ।

ছন্দের জন্ম

ছন্দের জন্মের ইতিহাসে পাই—বাল্মীকি ধ্যানমগ্ন, হঠাৎ একটা করুণ আতঁনাদে তাঁর ধ্যান ভংগ হ’ল। তিনি তাকিয়ে দেখলেন মিথুনরত দ্দুটো পারাবত-পারাবতীর মধ্যে একটিকে এক ব্যাধ হত্যা করেছে। পারাবতীর করুণ আতঁনাদ ধ্যানমগ্ন ঋষির অন্তরকে মথিত করল। সেই দ্রবীভূত করুণাধারা নিৰ্ঝরিতগীর মতই বোরিয়ে এলো—কবির মৃদু দিয়ে, উচ্চারিত হ’ল—

“মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং তদমগমঃ স্বাশ্বতীঃ সমাঃ

যৎ ক্ৰৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্”

এ বাণী উচ্চারিত হওয়ার পরই ঋষি কবির চিন্তা হ’ল—

“তস্যেথং ব্রুবতীশ্চিন্তা বভূব চাদি বীক্ষতঃ

শোকাতেনাস্য শকুনেঃ কিমিদং ব্যাহতং ময়া”

বীক্ষণশীল মৃদুনির অন্তরে জাগল, শকুনির শোকে শোকাতঁ হয়ে যা আমি উচ্চারণ করলাম—এ কী? তখন নিজের প্রজ্ঞা দৃষ্টি দিয়ে তিনি এর প্রকৃতি চিন্তা করতে লাগলেন—

“চিন্তয়ন্ স প্রজ্ঞাপ্রাজ্ঞচকার মতিমান্ মতিম্”

তারপর তিনি শিষ্যদের বললেন—

“পাদবন্ধোহক্ষরসমশ্লশ্রীলয়সমল্লিতঃ

শোকাতঁস্য প্রবৃন্তো মে শ্লোকো ভবতু নানাথা”

“এই বাক্য পদবন্ধ, এর প্রতিপদে সমাক্ষর, ছন্দের তন্ত্রলীয়ে এ আন্দোলিত ; আমি শোকাতঁ হয়ে একে উচ্চারণ করেছি, এর নাম শ্লোক হোক।” এই হল ছন্দের ইতিহাস।

এই “পদবাক্য”কে অবলম্বন করে সুর হু বিভিন্ন জিজ্ঞাসার। বিভিন্ন আলাংকারিকেরা সুর করলেন এই ‘পদবন্ধ’ বাক্যের বিচার করতে। সেই বিচার দ্দুটো ধারায় বিভক্ত—‘ছন্দঃ শাস্ত্র’ ও ‘অলাংকার শাস্ত্র’। অলাংকার শাস্ত্রে বিশ্লেষিত হল—

‘রীতি, অলংকার বক্রোক্তি, রস, ধ্বনি’ ।

ভাষা ও ছন্দ

ভারতীয়-আর্য ভাষা তিনটি স্তরে বিভক্ত—(ক) প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষা (বৈদিক সংস্কৃত) । খৃষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত । (খ) মধ্য-ভারতীয় আর্য ভাষা (অশোক ও অন্যান্য প্রত্নলিপির ভাষা, পালি, প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ) (অবহট্ট, অপভ্রষ্ট) । খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী পর্যন্ত । (গ) নব্য-ভারতীয় আর্য-ভাষা (বাংলা, হিন্দী, অসমীয়া, উড়িয়া প্রভৃতি) । খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী থেকে আজ পর্যন্ত ।

ছন্দ-বিচারেও তিনটি স্তর লক্ষ্যণীয়—

(ক) প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষায় পাই—অক্ষর মূলক ছন্দঃ পদ্ধতি

(খ) মাত্রা মূলক ছন্দঃ পদ্ধতি

(গ) নব্য-ভারতীয়-আর্য ছন্দের পদ্ধতি হচ্ছে—

অক্ষর মূলক, মাত্রামূলক এবং এদের সংগে রয়েছে অপভ্রংশে রচিত গান-কবিতা-ছড়ার ছন্দ ।

সংস্কৃত ছন্দ দু’জাতের—বৃত্তছন্দ ও জাতিছন্দ ।

“পদ্যং চতুষ্পদী তচ্চ বৃত্তং জাতিরীতিং দ্বিধা

বৃত্তমক্ষর সংখ্যাং জাতিমাত্রাকৃত্য ভবেৎ ॥”

ছন্দোমঞ্জরী ১/৪

অক্ষর বা বর্ণের সংখ্যা গুণে যে ছন্দ তাকে বলা হয় “বৃত্ত” এবং মাত্রার সংখ্যা দ্বারা যে ছন্দ প্রকাশ পায় তাকে বলা হয় জাতি ।”

বৈদিক ও সংস্কৃত ছন্দ

বৈদিক (আদি ভারতীয়-আর্য ভাষা) ছন্দের নীতি ছিল অক্ষরমাত্রিক । অর্থাৎ প্রধানত চরণে অক্ষরের নির্দিষ্ট সংখ্যার ওপর ছন্দের রূপ নির্ভর করত । তবে সেই অক্ষরের গুরুলঘুক্রমেরও নিয়ম ছিল । বৈদিক ছন্দে ছন্দের শেষ পর্ব ছাড়া অন্যত্র অক্ষরের লঘুগুরুক্রমন্যাসে বেশ স্বাধীনতা ছিল, কিন্তু সংস্কৃত ছন্দে সব পর্বেই অক্ষরের লঘুগুরুক্রম ছিল অনতি-ক্রমনীয় ।

বৈদিক ছন্দ চারটি—ত্রিষ্টুভ্, গায়ত্রী, জগতি ও অনুষ্টুভ্ । অবস্থা ও প্রাচীন ইরানীয় ভাষায়ও আছে ।

পালি প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ছন্দ

পালি সাহিত্যে ছন্দ মোটামুটি সংস্কৃতের মতো, অর্থাৎ অক্ষরমূলক এবং

কিচিং মাদ্রামূলক ।

প্রাকৃতে আর্য ছন্দ ‘গাথা’ (গাহা) নামে পরিচিত । এইটিই প্রাকৃতির বিশিষ্ট ছন্দ । একমাত্র ছন্দ বললেও ভুল বলা হ’ল বলে মনে করা চলে না ।

প্রাকৃতে ছন্দের যে দৈন্যতা দোঁখি অপভ্রংশে সে দৈন্যতা নেই । চরণের শেষে মিল এবং সমমাত্রিকতা থাকায় অপভ্রংশ শ্রুতিমাধুর্যে সংস্কৃতির অতিশায়ী বলা যেতে পারে । সাহিত্যিক অপভ্রংশ মধুর ভাষার অত্যন্ত কাছাকাছি এবং তার ছন্দ লৌকিক ছড়াগানের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে তার মধ্যে কথা ভাষার প্রাণ স্পন্দন অনন্দভূত হয় ।

গাহা ও দোহা ছাড়া প্রায় সমস্ত অপভ্রংশ ছন্দই চতুষ্পদ, এবং প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় চতুর্থ পাদে মিল, অর্থাৎ দুটো দ্বিপদের সমষ্টি, যেমন—

“সংপত্তিবি-সদ্রণও

তুরিঅংপর-বারণও ।

পিঅঅম দংসণ-লালসও

গঅবরু বিম্হিত-মাণসও”

(চার পাদ, প্রতিপাদে ১২ মাত্রা, ছয়-মাত্রার পর যতি । “জগতী”)

জয়দেব

মানুষের অগ্রগতির ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই, এক-একটা যুগকে প্রভাবিত করেছে কোনো কোনো মহাপুরুষ ; আবার দেখতে পাই কিছু সংখ্যক মহৎ লেখকের লেখাই যুগকে প্রভাবান্বিত করে জাগরণ এনেছে ।

যীশুর আবির্ভাবের আগে যেমন জন দি ব্যাপ্টিষ্ট এসে তাঁর আক্রমণের পথকে তৈরী করেছেন, চৈতন্য প্রভুর আবির্ভাবের আগে এসেছেন অদ্বৈত আচার্য, ঠিক তেমনি এক একটা যুগান্তরকারী আন্দোলনের আগে এসেছে এক-একখানা বই—ফরাসী বিপ্লবের আগে এসেছেন ভল্টেয়ার, রুশ-বিপ্লবের আগে পাই—গোগল থেকে সুরু করে গর্কী পর্যন্ত সাহিত্যিকদের অবিরাম সাহিত্য সাধনা, বাংলাদেশে স্বদেশী-আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছে—আনন্দ মঠের তথা “বন্দেমাতরম” মন্ত্রের প্রভাবে । ঠিক তেমনি আবির্ভূত হয়েছেন—কবি জয়দেব ।

বাংলা সাহিত্যের এবং গুজরাটী সাহিত্যের আদি গুরু হিসেবে যদি কারুর বন্দনা করতে হয়—তবে করতে হবে কবি জয়দেব এবং তাঁর গীতগোবিন্দকে ।

যে-নদীয়ায় আবির্ভূত হন চৈতন্যদেব, সেই নদীয়ার গঙ্গার ঘাটে বসত সুরাপায়ীদের আসর, বসত বারবণিতাদের উৎসব-সভা । যোন-বিকার ও ইন্দ্র-আসক্তির

নির্লজ্জ প্রসারে ছুবে যেতে বসেছিল বাঙালীর জাতীয় চেতনা। সেই সময়ে কেন্দ্রবিশ্বে আবির্ভূত হন কবি জয়দেব। তিনি রাধা-কৃষ্ণের লীলা বিষয়ক আদিরসাত্মক ছদ্মকো পদগুলির একটি বিশিষ্ট রূপদান করলেন তাঁর ‘গীতগোবিন্দে’। তিনি তাঁর গীতগোবিন্দে নিয়ে এলেন প্রেমের পাবক বাণী, বিকৃত মানবজীবনের সামনে তুলে ধরলেন—সঞ্জীবনী সূধা। তিনি তাঁর গীতগোবিন্দে তুলে ধরলেন না কোনো তত্ত্বকথা, নীতি বা উপদেশ। নরনারী যে-পিপাসায় বিভ্রান্ত হয়ে নিজেরাই বিষপাত্র গ্রহণ করে সে পিপাসা মানব জীবনে সত্য। সেই পিপাসার তৃপ্তি হতে পারে রসের আশ্বাদনে। জয়দেব তাঁর গীতগোবিন্দের রসধারায় জাতিকে মাত করিয়ে তৃষ্ণা-বিভ্রান্ত চিত্তকে পরিশুদ্ধ করে গেলেন।

জয়দেবের গীতগোবিন্দ একাধারে—কাব্যের রসঘন মর্দাতি, প্রেম-জীবনের ধাত্রী অপর দিকে বাংলা ছন্দের আদি পুরুষ। তাঁকে অনুসরণ করলেন কাব্য রচনায়, ছন্দ-নির্মাণে বৈষ্ণব পদকর্তারা। শূদ্ধ তাই নয় সেই ছন্দের নিবারণী রবীন্দ্রনাথকেও অনুপ্রাণিত করেছে—বিশেষ ভাবে।

গীতগোবিন্দের ভাষা—সংস্কৃত, ভাব বাংলা ; ছন্দ—অপভ্রংশ অনুসৃত।

প্রাকৃত যুগেই মাত্রাছন্দের প্রচলন সূত্র হয় ; অপভ্রংশে এর কাঠামোর কিছুটা পরিবর্তন ঘটে। চর্যার পদ কর্তারা পদ রচনায় এই ছন্দ-রীতি অনুসরণ করেছেন। তবে এটাও ঠিক যে চর্যার ছন্দ বাংলা মাত্রা ছন্দ এবং অপভ্রংশের মতো পঙ্ক্তি নির্ভর নয়, এর পর্ব-বিভাগ সুস্পষ্ট।

গীতগোবিন্দের পদগুলো অপভ্রংশ ছন্দে রচিত। তবে এর পদগুলোতে ধ্বনি সৌন্দর্য রয়েছে। ব্রজবুলির ছন্দ মৈথিল-পদাবলীর ছন্দের অনুকরণে রচিত। উমাপতি ও বিদ্যাপতির ছন্দ অপভ্রংশ থেকে নেওয়া। তথাপি মৈথিল ও ব্রজবুলির ওপর জয়দেবের প্রভাব গুরুতর। এই ছন্দের স্বরুপটি চিনতে হলে কিছুটা তার মাত্রার ওপর নির্ভর করতে হয়। গীতগোবিন্দের চতুর্বিংশটি গানের ২২টি গান মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। এই কাব্যে ‘সমপঙ্ক্তিক’ এবং ‘অসম পঙ্ক্তিক গঠন রীতি রয়েছে—

৪	৪	৪	৩	
অনিল ত / রল কুব / লয় নয় / নে-ন।	৪ / ৪ / ৪ / ৩ = ১৫			
তপতি ন / সাকিশ / লয় শয় / নে-ন ॥	ঐ			
	৪	৪	৪	৪
১৬ মাত্রার :	পশ্যতি / দিশি দিশি / রহসি ভ / বস্তুম্ = ১৬			
	৪	৪	৪	৪
	স্মরসম / রো-চিত / বিরচিত / বে-শা-।			
	৪	৪	৪	
	গলিত কু / স্নম দর / বিলুলিত / কে-শা-।			

এখানে শেষ পঙ্ক্তি—গদ্রদ্র; কোনোটি স্বরান্ত দীর্ঘ, কোনোটি হলন্ত।
শেষ পঙ্ক্তি গদ্রদ্র ধরাতে ১৫ মাত্রার স্থলে ১৬ মাত্রা হয়েছে। “ছন্দোমঞ্জরী”তে বলা
হয়েছে—

“সান্দ্রস্বরশ্চ দীর্ঘশ্চ বিসর্গী চ গদ্রদ্রভবেৎ।

বর্ণঃ সংযোগপদ্বর্শ্চ তথা পাদান্তগেহপি বা ॥” ১/১১

রজবদ্রলিতে আমরা তিন মাত্রা, চার মাত্রা, পাঁচ ও সাত মাত্রার পদ পাই। এটা
জয়দেবের প্রভাব জনিত।

চার মাত্রা :

মহদ্রবর / লোকিত- / মণ্ডল- / লী-লা-।

মধুরিপদ্র / রহিমতি / ভবন- / শী-লা-।

পাঁচ মাত্রা :

১১১ ১১ ১১১১১ ১১১ ১১ ২ ১ ২
“কিঞ্চিৎ সম / স্নেহপি হরি / রহ ন য / যৌ-বনম্
মম বিফল / মিদমমল // মপি রু-প যৌবনম্”

ঐ :

বদসি যদি / কিঞ্চিদপি / দন্তরুচি / কোমদুদী

হরতিদর / তিমিরতি / ঘোরম্।

সুফরধর / সীধরে / তব বদন / চন্দ্রমা-।

রোচয়তি / লোচন-চ- / কোরম্।

তুঃ ভানুসিংহ (রবীন্দ্রনাথ)

“গ্রাম্যকুল / বার্লিকা / সহজে পশু / পার্লিকা-

হামকিয়ে / শ্যামউপ / ভোগ্যা

রাজকুল / সম্ভব / সুরমিরহ / গোরবা।

যোগ্যজনে / মিলয়েজনু / যোগ্যা”

ভানু সিংহ :

৪ ৪ ৪ ৪
সতিমির / রজনী- / সচ্যকিত / সজনী-। =৮

২১১ ১২২ ১২১
শূন্য- / নিকুঞ্জ / অরণ্য। =১২

৪ ৪ ৪

“মধুর কোমলকান্ত পদাবলী রচনা করতে গিয়ে জয়দেব অননুভব করেছিলেন যে সংস্কৃত ব্যাকরণকে অনুসরণ করে কাব্য রচনা করতে গেলে বর্ণের হ্রস্বদীর্ঘকে যথাযথ অনুসরণ করতে হবে। অথচ কবির কানে সবদাই ধ্বনিত হচ্ছে—অপভ্রংশের ছন্দ। যেখানে মাত্রা নিরূপণ করার পদ্ধতি হচ্ছে—

“লব্ধগুরু এক গিঅম গিহি জেহা।”

তাই জয়দেব ছন্দ নির্মাণে প্রাকৃত-অপভ্রংশের নিয়মের পথ ধরেই চলেছেন। ‘অক্ষরবৃত্তে’ তিনি সংস্কৃত রীতিকে অনুসরণ করলেও ‘মাত্রাবৃত্তের’ ক্ষেত্রে প্রাকৃত মাত্রাবৃত্ত ছন্দোন্নীতিকে অনুসরণ করেছেন। তাই গীতগোবিন্দের পদগুলো বহুলাংশে গুরু-গম্ভীর হলেও, গানগুলো সত্যি “মধুরকোমলকান্ত” হয়ে পড়েছে।

চর্যার ছন্দ

অর্বাচীন অপভ্রংশের অর্থাৎ লৌকিকের বিশিষ্টতম ছন্দ ছিল “চতুষ্পদী”, যার সগোত্র “পাদাকুলক” প্রভৃতি। “ষোড়শ মাত্রিক পাদাকুলক ছন্দটি “লব্ধগুরু” বেড়া জাল থেকে নিজেকে অনেকটা মুক্ত করতে পেরেছিল বলে ছন্দোনির্মাণে একচ্ছত্র হতে পেরেছিল। “প্রাকৃত পৈঙ্গলে” বলা হয়েছে—

“লব্ধগুরু এক গিঅম গিহি জেহা

পঅ পঅ লেক্খি উত্তম রেহা।

সুকই-ফগিন্দহ কঠহ বলঅং

সোলহমন্তা পাআকুলঅং”

সংস্কৃত “পজ্জটিকা” অপভ্রংশে পাদাকুলকে পরিণত হয়েছে। ডঃ সুকুমার সেন ‘পাদাকুলক’ এর বৃত্তপতি সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন—‘পজ্জটিকা’ (গন্ধিতিকা) ও পাদাকুলক (=পদ সমষ্টি)। তিনি আরও বলেছেন “পয়ার” শব্দটির ছন্দ-নাম রূপে ব্যবহার অষ্টাদশ শতাব্দির আগে ঘটে নাই। ইহা ‘পদ’ শব্দ হইতে উৎপন্ন নহে। ইহার আসল মানে “তরল প্রবাহ”, ছন্দে “বর্ণ-নাময় ঢালা আবৃত্তি”। সুদূর গীত হইলে বলা হইত নাচাড়ী (* নৃত্যপাটিক)। পরে নাচাড়ীর নামান্তর ‘দ্বিপদী’ চলিত হইয়া গেলে পয়ারের আধুনিক অর্থ আসিয়াছে”

ভাষার ইতিবৃত্ত। পৃঃ ৩৮১ (দ্বয়োদশ সংস্করণ, ১৯২৯)।

বাংলা পয়ারের জন্ম হয়েছে—‘চতুষ্পদী’ থেকে। চর্যার পদগুলোর বেশির ভাগই এ ছন্দে রচিত। চতুষ্পদী (‘চউপদী’, অপভ্রংশে) ‘অতিশঙ্করী’র মতো ছন্দ; এর মাত্রা সংখ্যা ১৫। এর থেকেই ১৪ মাত্রার পয়ারের জন্ম। (১ মাত্রা ‘যতি’ শোষণ করে নিলে)। যেমন—

৮

“নিতি নিতি সিআলা- / সিহে সম জুঝই

ঢেংঢণ-পায়র গীত / বিরলে বুঝই”।

এই $৮+৭=১৫$ পরে $৮+৬=১৪$ হয়ে পয়সারে পরিণত হয়েছে। ডঃ সন্দুকার হও
সেন বলেন ১৪ মাত্রার শঙ্করী জাতীয়, চতুর্দশ-মাণিক (৮+৬), প্রথম মাত্রা সাধারণত টে
গুরু। যেমন—

“হুঁ” যুবতী / পাতিয়ে হীন
গঙ্গা সিনাইবাক / জাইয়ে দিন।”

বাংলা গ্রন্থদ্বয়ের প্রাচীনতম রূপও চৰ্চাতে পাই—

୪ ୪
“କିନ୍ତୋ- / ମନ୍ତେ- କିନ୍ତୋ- / ତନ୍ତେ”
କାନ୍ତୋରେ / ବା-ମବ / ଥା-ନେ- । ୧୨

তুলনীয় জয়দেবে—

“রতি” স্ব+স+র+ “গতি” গ+তি+ “সি” স+ “র+”
 ম+দ+ন+ম+ / নো+হ+র+ / বে+শ+ম+ । (৮+৮+১২)

বৈষ্ণব পদাবলীর ছন্দ

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন “বৈষ্ণব পদাবলীতে বাংলা সাহিত্যে ছন্দের প্রথম ঢেউ ওঠে। কিন্তু দেখা যায় তার লীলা বৈচিত্র্য সংস্কৃত ছন্দের দীর্ঘ হ্রস্ব মাত্রা অবলম্বন করেই প্রধানত প্রকাশ পেয়েছে।”

আধুনিক বাংলা ছন্দের কথা বলার আগে ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য বৈষ্ণব পদাবলী থেকে কিছু পদ উদ্ধৃত করা হ'ল।

বৈষ্ণব পদাবলীর দুটো ধারা—ব্রজব্দুলী এবং বাংলা ভাষায় রচিত। ছন্দের ক্ষেত্রেও দেখা যায় বাংলা ছন্দের দুটো রূপের প্রাচীন রূপ রয়েছে। এবং সাগান্য কিছু পদে পাই চলতি ভাষার ছন্দ যার ভাষা হল ‘অসাধু’।

বাংলা কাব্যের মূল ছন্দ হচ্ছে—তান প্রধান ও ধনি প্রধান তারপর সাহিত্যের আসরে স্থান লাভ করল অসাধু ভাষার ছন্দ—ছড়ার ছন্দ।

ছন্দের ক্ষেত্রে বৈষ্ণব পদাবলীতে দুটো রীতি বিশেষ প্রচলিত— (১) মাগবৃত্ত
(২) অক্ষরবৃত্ত কয়েকজন পদকর্তা ছড়ার ছন্দেও কিছু পদ রচনা করেছেন।

অক্ষরবৃত্তের প্রধান ও আদি পদকর্তা হচ্ছেন—বড়ুচন্ডীদাস। তিনি তাঁর “শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন” কাব্যটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচনা করেছেন এই গ্রন্থের প্রধান—হল পয়ার ছন্দ এবং পয়ারের রূপটি যথাসম্ভব বজায় আছে। গান করার জন্য পদগুলো রচিত

হার স্বরধ্বনির উচ্চারণ পদ্রোপদ্রির একমাত্রিক নয় এবং প্রয়োজন বোধে দীর্ঘস্বর
টেনে পড়তে হয়—

অ'স'াঢ়' (=আঅসাত্) ম'সে' ন'ব' / মে'ঘ' গ'র'জ'এ' ৮+৬

ম'দ'ন' ক'দ'নে' মে'র' / ন'র'ন' স'দ'র'এ' ॥ ৮+৬

তবে মাঝে মাঝে ১৪ অক্ষরের বেশিও দেখতে পাওয়া যায়—

১০ ৬

ফুটিল কদম ফুল ভরে / নৌআইল ডাল

এভৌ গোকুলক নাইল / বাল গোপাল

শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে চার ছাঁদের 'ত্রিপদী'ও দেখতে পাই—

(১) ৬+৬+৮ (২) ৮+৮+১৭ (৩) ৮+৮+১৪ (৪) ৮+৮+৮

৬

৬

(১) কথ' না বসসি / কথ' তোর ঘর ।

৮

যাইবে কোমণ দেশে

মাত্রা গণনায় উচ্চারণ পদ্ধতি সব সময় রক্ষিত হয়নি, ব্যতিক্রম দেখতে পাই ।

এগার অক্ষরে, দশ অক্ষরের ছন্দ আছে—

“ব'ল'িতে' না'র'এ' / তে'র' চ'র'িতে' ৬+৫=একাবলী

দশ অক্ষরের ছন্দ—

কু'শ'লে' কি' / অ'ছ'হ' না'তি'নি' । ৪+৬=১০

দ্বিপদ ও ত্রিপদ মিশ্র ছন্দও শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যায়—

প্রথম ছয় পয়ার, দ্বিতীয় ছয় দশাক্ষর (৬+৪)—

“হার কেয়র রাধা / সব মোর নে । ৮+৬

বাঁশীগ'দ'টি / আন'ী মোক দে ।” ৪+৬

মধ্য যুগের বাংলা ছন্দ

মধ্যযুগে বাংলা ছন্দের অক্ষরের মাত্রাসম উচ্চারণ রীতি ক্রমশ হ্রস্ব দীর্ঘস্বর
সমান হয়ে গেল, ফলে ত্রিপদীর লালিত্য ও প্রবহমানতা বেড়ে গেল । পদান্ত অ-কারের
লোপের ও স্বাসাঘাতের স্পষ্টতার জন্য ‘বহবক্ষর’ শব্দ দ্ব্যক্ষরে (disyllabi) পরিণত
হয় । ফলে দুর্দাদিক থেকে ছন্দে শক্তি দেখা দেয় । প্রথম চরণার্থে অক্ষরবহ ক্ষমতা
বেড়ে গেল—পয়ার ছয় ষোল-সতের অক্ষর স্থান দখল করতে সুরু করে এবং এর ফলে

গদ্যের কাজ চালানর পক্ষেও পয়ার আরও বেশি উপযোগী হ'ল বাংলা ছন্দ তখনো
সুদূরপ্রধান ছিল, ফলে অক্ষরবৃদ্ধি কানে বাজত না—

অনন্ত কামধেনু যাহাঁ / চরে বনে বনে

দুঃস্বাদ দেন কেহ না / মাগে অন্য ধনে ॥

ত্রিপদীর বেষ্ঠনীতে ছড়ায় নৃত্যচপলতা বাঁধা পড়ল। লোচনদাসের “ধামালী”
পদাবলীতে—

জ্বালার উপর / জ্বালা সহি // জ্বালার উপর / জ্বালা

জল্কে যাই / পথ না পাই // বসন্টানে / কালা

জ্ঞান দাসের—

নন্দের বাড়ী / তমাল গাছে // কনকলতা / বেড়ি।

কালা দেহ / পীত বসন্ // নীল বসনে / গোরী ॥

ডঃ সুকুমার সেন এই ধামাবলীর সঙ্গে তুলনীয় লৌকিক “নিশিপাল” ছন্দের
উল্লেখ করে উদাহরণ দিয়েছেন—

গিরি টরই / মহি পড়ই / নাগমন / কম্পি আ

তরণি-রথ / গগন-পথ / ধূলি ভরে / কম্পি আ ॥

ব্রজবুলি

সংস্কৃতে দীর্ঘস্বর ধ্বনি দু'মাত্রার ছিল, অপভ্রংশে তা ধীরে ধীরে শিথিল
হয়ে এসেছে এবং মৈথিল পদগুলোতে দীর্ঘস্বরকে দু'মাত্রার আসন দেওয়া হয়নি
বললেই চলে। বিশেষ করে গানের মধ্যে সুরের তালই এনেছে এই সংকোচন রূপটি।
সংবৃত্ত শব্দকে দু'ভাবে গানের মধ্যে ধরা হয়েছে—অর্থাৎ প্রয়োজনানুসারে কখনো
‘দীর্ঘ’ আবার কখনো ‘হ্রস্ব’ করে ধরা হয়েছে—

“প্রাকৃত পৈঙ্গল” এ হ্রস্বস্বরান্ত ও দীর্ঘস্বরান্ত Closed এবং Open
Syllable কে যে ভাবে ধরা হয়েছে বিদ্যাপতি মূলতঃ সে-পন্থাই অনুসরণ করেছেন—

“দীর্ঘ সংযুক্তপরো, বিন্দুজুড়ো পাড়িআ অ চরণতে।

সুগরু বংক দমন্তো, অগ্নো লহু হোই স্নক একঅলো ॥”

অর্থাৎ সংযুক্তাক্ষরের পূর্ব অক্ষর, বিন্দুযুক্ত অক্ষর, চরণের শেষ অক্ষর দীর্ঘ।

আবার কখনো কখনো সংযুক্তপূর্ব অক্ষর লব্ধ হয়ে পড়েছে। সানুস্বর,
ই-কার, হি-কার, ষ, এ-কার, ও-কার, রেফ পূর্ব বর্ণে থাকলে অনেক সময় গুরু
আবার অনেক সময় লঘু হিসেবে ধরা হয়েছে।

“প্রাকৃত-পৈঙ্গল” এর সুদৃগলো বিচার করলে দেখা যায় যে প্রাকৃত অপভ্রংশ যুগ থেকে ছন্দ রচনার ক্ষেত্রে হ্রস্ব-দীর্ঘ-স্বর বা সংযুক্তব্যঞ্জন প্রভৃতি কোনো ধর্মানি আর সংস্কৃতের মতো শুদ্ধ ভাবে উচ্চারিত হচ্ছে না। বিদ্যাপতি এবং তাঁর পরবর্তী কবিদের রচিত পদের ছন্দ বিশ্লেষণ করলে এই শৈথিল্য দেখতে পাওয়া যাবে।

১১ মাত্রার পদ :-

জহাঁ জহাঁ / পদজুগ / ধরঙ্গি	৪ / ৪ / ৩	
তহিঁ তহিঁ / সরোরহ / ভরঙ্গি	ঐ	
জহাঁ জহাঁ / ঝলকত / অঙ্গ—	ঐ	
তহিঁ তহিঁ / বিজুদরিত / রঙ্গ—	ঐ	(মাত্রাবৃত্ত)

চতুর্মাত্রক ত্রিপাণ্ডিক :-

জলউ জ : লধি জল / মন্দা—	
জহা বসে / দা-রুগ / চন্দা—	
বচন ন : হি কে পর / মানে— ॥	৪ / ৪ / ৪ (মাত্রাবৃত্ত)

সন্মাত্রক দ্বিপাণ্ডিক :-

বচন কহবি / কাঁদন মা-খি।	৬ / ৬	
মা-ন করবি / আদর রা-খি।		
জব করে ধরি / নিকট আ-নি।		
উহু উহু কএ / কহবি বা-নি ॥		(মাত্রাবৃত্ত)

১৪ মাত্রার (৪+৪+৪+২)

সুন্দরি / চল লিহু / পহু ঘর / না—।	৪ / ৪ / ৪ / ২
চহুঁদিস / সাখি সব / কর ধর / না।	

২	১ ১ ১ ১১১ ১১১১	
(যব)	গোধূলি সময় / বে-লি-	(২) ৬ / ৪
(ধনি)	মন্দির বাহির / ভে-লি-	ঐ
	নবজলধর / বিজুদরি রে-হা	৬ / ৬
	দন্দপসারি / গে-লি-	৬ / ৪ (মাত্রাবৃত্ত)

যব = অতি পর্ব ; বে-লি = অপূর্ণ পর্ব।

ত্রিপদী :

আ-জ দেখি এ সখি বড় অনদ্‌মনি সনি
 বদন মলিন মুখ তো-রা- ৮ / ৮ / ১২
 (জয়দেবের— “চন্দন চাঁচত নীল কলেবর
 পীত বসন বনমালী” অনদ্‌করণে রচিত)

জ্ঞান দাস :

শুন শুন / নিরদয় / কান ৪ / ৪ / ৩
 তহুঁ অতি / হৃদয় পা : ষা-ণ ॥

গোবিন্দ দাস :

শারদ চন্দ / পবন মন্দ ৬ / ৬
 বিপিনে ভরল / কুসুম গন্ধ ৬ / ৬
 ফুল্ল মনি / মালতি যুধি ৬ / ৬
 মত্তমধুপ / ভোরণী ৬ / ৫ (মাহাবৃত্ত)

তুঃ রবীন্দ্রনাথ :

গহন কুসুম / কুঞ্জ মাঝে ৬ / ৬
 মৃদুদল মধুর / বংশী বাজে ৬ / ৬
 বিসরি হাস / লোক লাজে ৬ / ৬
 সজনি আও / আও লো ॥ ৬ / ৫ (মাহাবৃত্ত)

রায় শেখর :

কি পেখনু / গৌর কি : শোর । ৪ / ৪ / ৩
 সুর্ধনি / তী-রেউ : জোর ”
 সু ঘর ভ : কতগণ / সঙ্গ ঐ
 করতাই / কত কত / রঙ্গ ঐ (মাহাবৃত্ত)

বলরাম দাস :

জিনি মদ / কুঞ্জর // গতি অতি / মন্থর । ৪ / ৪ / ৪ / ৪
 অধর স্দ : ধা-রস // মধুর হ : সিত বর ॥ ঐ (মাহাবৃত্ত)

(লঘু ত্রিপদী)

সদাই ধিয়ানে / চাহে মেঘ পানে

না চলে নয়ান তারা ।

৬ / ৬ / ৮

৮

অক্ষরবৃত্ত ।

না জানি কতেক মধু

শ্যাম নামে আছে গো

৮

বদন ছাড়িতে নাহি পারে ।

১০

৮+৮+১০ (দীর্ঘ ত্রিপদী) অক্ষরবৃত্ত ।

১১ মাত্রা :

না বাঞ্ধে চিকর / না পরে চীর ।

৬ / ৫

না খাএ আহার / না পিএ নীর ॥

৬ / ৫

৮+৬=১৪ (পয়ার—লঘু)

তোমারে বদ্ব্যই বন্ধু / তোমারে বদ্ব্যই ।

৮+৬

ডাকিয়া সোধার মোরে / হেন জন নাই ॥

৮+৬

শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দ : (স্বরবৃত্ত)

মুরারি গুপ্ত, বাসু ঘোষ, জ্ঞান দাস, লোচন দাস, গোবিন্দ দাস প্রভৃতি
পদকর্তারা বাংলায় লৌকিক ছন্দে কিছু পদ রচনা করেছেন—

মুরারি গুপ্ত :

রাধার ভাবে / আকুল প্রাণ / গোকুল পড়ে / মনে

৪টি পর্ব ; একটি অপূর্ণ পর্ব, শ্বাসাঘাত অনুভূত হয় ।

বাসু ঘোষের—

দিগ বিদিগ / নাহি গোরার / না চিনে নিজ / পর

ঘুমে পড়ি / কাঁদে নিতাই / ভাইয়া ভাইয়া / বলি ।

শ্বাসাঘাত অনুভূত হয় ।

গোবিন্দ দাস :

তোরে নিষেধ / করি বাঁশী // তোরে নিষেধ / করি ।

রায় শেখর :

ঠাম ঠমকা / কাঁকান বাঁকা / মধুর মাখা / হাসি

বিশচন্দ্রে / কোল করে / করপদে / আসি

৪ / ৪ / ৪ / ২ = ১৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা ছন্দের স্মৃতিকাগার থেকে আরম্ভ করে কৈশোর পর্যন্ত আলোচনা করেছি। এবারে বয়ঃসন্ধির আলোচনা করে ছন্দের লালিত্যময় যৌবনের কথাই আসবে। তবে তার আগে অক্ষর, পর্ব, যতি ইত্যাদির শ্রেণী ভাগ করে ঊনবিংশ শতাব্দির ছন্দের ইতিহাসে যে নোতুন স্ব মধুসূদন এনেছিলেন তার আলোচনা করে পরবর্তী কালের ছন্দের আলোচনা করব।

বাংলা ছন্দের প্রকার ভেদ

“বৃত্তছন্দ” ও “জাতিছন্দ” হল সংস্কৃত ছন্দ। বৃত্তছন্দে অক্ষর সংখ্যা এবং “জাতিছন্দে” মাত্রা সংখ্যা দিয়ে এই দুটো ছন্দের স্বরূপ এবং পার্থক্য নির্দেশ করা হয়েছে থাকে। বৃত্তছন্দ এবং জাতিছন্দ পরবর্তীকালে “অক্ষরবৃত্ত ছন্দ” এবং “মাত্রাবৃত্ত ছন্দ” নামে পরিচিত হয়েছে।

সংস্কৃত—তোটক, তুণক, রুচিরা, মালিনী, মন্দাকান্তা প্রভৃতি ছন্দ হচ্ছে অক্ষরবৃত্ত ছন্দ এবং পঙ্কটিকা, আষা প্রভৃতি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে গঠিত, বাংলাতেও ঐ দু'ধরনের ছন্দ রয়েছে। উপরন্তু অপভ্রংশের একটি ছন্দ বাংলাতে দেখতে পাওয়া যায় (নিশিপাল)—সেটাই হয়েছে স্বরবৃত্ত ছন্দ।

বিভিন্ন ছান্দসিক এই তিন প্রকার ছন্দের বিভিন্ন নাম দিয়েছেন।

অক্ষরবৃত্ত : এই নামটি দিয়েছেন—ছান্দসিক প্রবোধ চন্দ্র সেন। হালে তিনি ঐ ছন্দের নোতুন নামকরণ করেছেন—**মিশ্রকলারূপ-রীতি** (mixed mori style) ; রবীন্দ্রনাথ এর নাম দিয়েছেন—‘সাধু বাংলার ছন্দ’ ; অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় নাম দিয়েছেন—‘তান প্রধান ছন্দ’। ডঃ সুকুমার সেন, তাঁর ‘ভাষার ইতিবৃত্ত’ গ্রন্থে (৩৮৬ পৃঃ) একে বলেছেন ‘প্রবীণ তন্দব ছন্দ’।

তিনি স্বাসাঘাত প্রধান ছন্দ সম্বন্ধে ভাষার ইতিবৃত্তে (পৃঃ ৩৮৬) বলেছেন—“ষোড়শ শতাব্দির মধ্যভাগে রাঢ়ীতে পদে আদি স্বরাঘাত ও অন্ত্য অ-কার লোপ প্রতিষ্ঠিত হইলে পরে কোঁক-দেওয়া চপল ছড়ার-ছন্দ গ্রিপদীর দলে স্থান পাইল

তবে এ ছন্দের মেয়েলি সুর ও খেয়ালি চাল রৈক্য-কবি সমাজের বাহিরে শিষ্টরচনায় সমাদর পায় নাই। ঊনবিংশ শতাব্দের মধ্যভাগে দ্বৈত চন্দ্র গুপ্ত এই ধরনের ছন্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন প্রধানত হাস্যরস সৃষ্টির কাজেই। পরে শতাব্দের শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথ এই নাচনি ছন্দের সঙ্গে বুনিয়া দি তানপ্রধান ছন্দের কলম বাঁধিয়া দিলেন। তাহাই এখন “বল প্রধান” বা “স্বাসাঘাত প্রধান” ছন্দ বলিয়া পরিচিত। ইহাকে দ্বিতীয় “নবীন তত্ত্ব” ছন্দ বলা যায়। পয়ার-বিপদীকে তানপ্রধান ছন্দ নাম দিলে এটিকে তালপ্রধান ছন্দ বলিব।”

স্বাসাঘাত প্রধান ছন্দটির নাম ‘স্বরবৃত্ত’ দিয়েছেন প্রবোধ চন্দ্র সেন। হালে আবার তিনি এর নাম দিয়েছেন—দলবৃত্ত।

মাত্রাবৃত্ত : এই নামটিও দিয়েছেন প্রবোধ চন্দ্র সেন, হালে, এর নোতুন নামকরণ করেছেন—কলাবৃত্ত। রবীন্দ্রনাথ এর নাম দিয়েছেন—সংস্কৃত ভাঙা ছন্দ। অমূল্যধন এর নাম দিয়েছেন—ধ্বনি প্রধান ছন্দ।

শিল্পীরা যখন শিল্পবস্তু তৈরী করতে সুরু করেন, তখন তাঁদের প্রয়োজন উপকরণের।

সাহিত্য কাব্য সৃষ্টি করতে গেলে দরকার অক্ষরের (syllable)।

অক্ষর : বাগধনের সামান্য চেষ্টায় যে ধ্বনি সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয়—অক্ষর। তবে একথা স্মরণ রাখতে হবে যে স্বরধ্বনি ছাড়া অক্ষর উচ্চারিত হতে পারে না। ব্যঞ্জন বর্ণ উচ্চারণ করতে হলে স্বরবর্ণের বা স্বরধ্বনির প্রয়োজন, ব্যঞ্জনযুক্ত না হলেও সব স্বরধ্বনিই অক্ষর। যেমন—অ, আ, ই, প্রভৃতি।

অক্ষর দু’ধরনের—স্বরান্ত ও হলন্ত। স্বরান্ত অক্ষর—বিবৃত (Open) এবং হলন্ত অক্ষর—সংবৃত (Closed)।

বিবৃত অক্ষরের প্রবোধ চন্দ্র হালে নামকরণ করেছেন—মুক্তদল। এবং সংবৃত অক্ষরের নাম দিয়েছেন—রুদ্ধদল।

ব’ল, শোনো, গেল প্রভৃতি অক্ষর স্বরান্ত। অর্থাৎ অন্ত্যে স্বরধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে। এবং নাম্, দান, গান, জন্ প্রভৃতি অক্ষরের অন্ত্যে স্বরধ্বনি না থাকায় তাদের বলা হয়েছে ‘হলন্ত’ বা হসন্তমূলক অক্ষর।

বাংলা উচ্চারণ-রীতি সংস্কৃত উচ্চারণ-রীতির মতো নয়। বাংলায় অক্ষর হয় হ্রস্ব না হয়—দীর্ঘ। হ্রস্ব অক্ষর—এক মাত্রার এবং দীর্ঘ অক্ষর দু’মাত্রার কবিতা আবৃত্তিতে একটু মন ও কান পেতে রাখলেই ধরা পড়ে—কোন অক্ষর হ্রস্ব এবং কোন অক্ষর দীর্ঘ উচ্চারিত হচ্ছে। যেমন—‘জননী’—একে বিশ্লেষণ করলে পাই—

জ+ন+নী ; আবার ‘শরৎ’ কে বিশ্লেষণ করলে পাই—শ+রৎ । তবে মনে রাখতে হবে যে হলন্ত অক্ষর যদি কোনো শব্দের শেষে থাকে তবে সাধারণতঃ সেগদুলোকে ‘দীঘ’ বলে ধরা হয়ে থাকে ।

‘সকালে সিনানে’ এই পর্বটিতে রয়েছে ৬টি স্বরান্ত অক্ষর—সদুতরাং এর মাত্রা সংখ্যা—৬ । “শরৎ কালের” হলন্ত অক্ষর হলেও অন্ত্যাক্ষর হওয়ার এরাও দীঘ—শ+রৎ কা+লের হলেও মাত্রা সংখ্যায় এরাও—৬ ।

অক্ষরের মধ্যে—লঘু, গুরু, মৌলিক, যৌগিক, স্বভাব-মাত্রিক এবং প্রভাব-মাত্রিক অক্ষর রয়েছে ।

লঘু অক্ষর : যে অক্ষর উচ্চারণে বাগযন্ত্রের স্বল্প আয়াস প্রয়োজন—তাকে লঘু অক্ষর বলা হয়—মেলা, হেলা, খেলা, দোলা—প্রভৃতি ।

গুরু অক্ষর : যে অক্ষর উচ্চারণে বাগযন্ত্রের বেশি আয়াস দরকার—তাকে গুরু অক্ষর বলে—দক্ষিণ, গম্ভীর, অম্বর প্রভৃতি ।

মৌলিক : যে অক্ষরগদুলোতে একটি ধ্বনি থাকে তাকে মৌলিক অক্ষর বলা হয়—আলো, কালো, ধরি, করি, সতী প্রভৃতি । এদের প্রতিটি অক্ষরে এক একটি ধ্বনি রয়েছে ।

যৌগিক অক্ষর : যে অক্ষরে একটির বেশি ধ্বনি থাকে তাকে যৌগিক অক্ষর বলে—ঐ, ঔ, অ+ই=ঐ ; অ+উ=ঔ । তবে যৌগিক অক্ষরে দু’টো ধ্বনি থাকলেও তারা থাকে হরিরহরাওয়া হয়ে অর্থাৎ তারা পরস্পরে জড়িয়ে থাকে—এখানে বিচ্ছেদ নেই । হলন্ত অক্ষরকেও অনেক সময় যৌগিক অক্ষর হিসেবে ধরা হয়—রঙ, সঙ, হাত্, রাত্, কাত্ প্রভৃতি ।

স্বভাব-মাত্রিক অক্ষর : যে অক্ষর অনায়াসে এবং স্বাভাবিক ভাবে উচ্চারণ করা হয়, তাকে স্বভাব-মাত্রিক অক্ষর বলা হয়—এসো, বসো, শোনো প্রভৃতি ।

প্রভাব-মাত্রিক অক্ষর : কোনো অক্ষর উচ্চারণ করতে গিয়ে যদি কোনো বিশেষ পদ্ধতিতে উচ্চারণ করতে হয় তাকে প্রভাব-মাত্রিক অক্ষর বলা হয়—যেমন—

“দেশ দেশ নন্দিত করি, মন্দির তব ভেরী”

এখানে ‘দে’ এর এ-কারের ওপর ; ‘ভে’ র এ-কারের ওপর ; এবং ‘রী’র ঈ-কারের ওপর জোর বা Stress দিয়ে পড়া হয় ।

যতি ও ছেদ : (Metrical pause and sense pause) উচ্চারণ

বিরতিকে ছেদ বা যতি বলে—কথা বলার সময় অথবা কোনো কবিতা পাঠ করার সময় একটানা উচ্চারণ না করে স্থান বিশেষে থেমে গিয়ে আবার পড়তে সুরু করি বা কথা বলতে সুরু করি। এই থামাটুকুর প্রয়োজন হচ্ছে অর্থদ্যোতনার জন্য। বাক্য বা বাক্যাংশের পর উচ্চারণের এই বিরতিকে “অর্থযতি” অথবা “ভাবযতি” (sense pause) বলা হয়। অর্থ প্রকাশের জন্যে ধ্বনি-প্রবাহের মধ্যে উচ্চারণ-বিরতির প্রয়োজন দেখা দেয়—

রাধার কি হৈল অন্তরে / ব্যথা
বসিয়া বিরলে / থাকয়ে একলে... ..

‘/’ চিহ্নিত অংশে বিরতির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

ছেদ : ছেদ দু’রকমের হতে পারে। কোনো চরণের যে অংশে প্রথম থামতে হয় তাকে উপছেদ বা অর্ধছেদ বলে। সাধারণতঃ বাক্যাংশের পর অল্পক্ষণের জন্য যে বিরতি এসে পড়ে সেই বিরতিকে উপছেদ বলা হয়। পূর্ণছেদের বিরতি অর্ধছেদের চেয়ে দীর্ঘতর—

ফাগুন এল দ্বারে / কেহ যে ঘরে নাই ॥
পরান ডাকে কারে / ভাবিয়া নাই পাই ॥

‘দ্বারে ও কারে’র পর পড়েছে অর্ধছেদ এবং ‘নাই ও পাই’র পর পড়েছে পূর্ণছেদ। তবে মনে রাখতে হবে—‘যতি’ ও ‘ছেদ’ ঠিক বস্তু নয়। কবিতার অর্থদ্যোতনার জন্য এবং শ্বাস নেবার জন্য যে ক্ষণিক বিরতি ঘটে তাকে ছেদ বা Sense pause বলে। এবং কবিতার একটি চরণের যতটুকু অংশ এক একটি ঝোঁকে (Impulse) উচ্চারিত হয় সেই উচ্চারিত অংশের পর যে বিরতি আসে তাকে যতি বা Metrical pause বলা হয়, এবং ঠিক সেই ভাবেই অংশগুলোকে চিহ্নিত করা যেতে পারে—

সুদূর গগনে / কাহারে সে চায় ? ॥
ঘাট ছেড়ে ঘট / কোথা ভেসে যায় ? ॥

নব মালতীর / কচিদলগলি / আনমনে কাটে / দশনে ॥

‘/’ টান যতির নির্দেশক আর ‘//’ টান ছেদের নির্দেশক।

যতি দিয়েই ছন্দের ঐক্যবোধ জাগিয়ে তোলে। ছেদ—অর্থপ্রকাশের একান্ত সহায়ক। লঘু যতি, অর্ধ যতি, পূর্ণ যতি—নীচে দেখান হ’ল—

“যাহারা তোমার / বিষাইছে বায় ॥ নিভাইছে তব / আলো।

/ = লঘু, // = অর্ধ, ‘/’ = লঘু, । = পূর্ণছেদ

পৰ্ব যতি লোপ :

লজ্জা দিয়ে // সজ্জা দিয়ে // দিয়ে আব -রণ,

তোমাৰে দূৰ্ : লভ কৰি // করেছে গো : পন ।

পৰ্বযতি লোপ করা হয়েছে : চিহ্ন দিয়ে

চরণ : ইংরাজীতে একে বলা হয় Metrical line (Verse) । পদ্যখানি যেখানে ধ্বনি প্রবাহকে নিয়ন্ত্ৰিত করে সেখানে সেই নিয়ন্ত্ৰিত পদ্যধ্বনি-প্রবাহকে চরণ বলে । কয়েকটি পৰ্ব মিলে একটি চরণ গঠিত হয় । এক, দুই এবং তিন পঙ্ক্তি চরণও হতে পারে । সুতরাং চরণ ও পঙ্ক্তি এক বস্তু নয় । অনুপ্রাস বোঝার জন্য সাধারণতঃ চরণকে নানা ভাবে ঢেলে সাজান হয়ে থাকে । চরণকে দ্বিপদী, ত্রিপদী প্রভৃতিতে সাজান যেতে পারে । সম, অসম পৰ্ব দিয়েও 'চরণ' তৈরী হয়ে থাকে—

‘চন্দন তরু যব

সৌরভ ছোড়ব

সসধর বরিখব আগি’

(দ্বিপদী)

“গোরা অভিষেক কথা অন্ভূত কখন

শূন্যিয়া পাঁড়িত ঘরে ধায় ভক্তগণ”

(দ্বিপদী)

“হেথা দূতী রাই মনে ছিল।”

(একপদী)

“কাঁকন-জোড়া এনে দিলেন যবে

ভেবেছিলাম হয়তো খুঁশি হবে।”

(একপদী)

“নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালস।

সোনার আঁচল খসা, ।

হাতে দীপ শিখা” ।

(ত্রিপদী)

“দুয়ার জুড়ে কাঙাল বেশে ।

ছায়ার মতো চরণ দেশে ।

কঠিন তর নুপুৰ ঘেঁষে ।

আর বসে না রইব” ।

(চৌপদী)

“হে ভুবন

আমি যতক্ষণ

তোমারে না বেসেছিঁ ন ভালো

ততক্ষণ তব আলো

খুঁজে খুঁজে পায় নাই তার সব ধন” ।

(অসম পর্বে গঠিত চরণ ।)

“সকাল বেলা কাটিয়া গেল

বিকাল নাহি যায়”

(একপদী/রবীন্দ্রনাথ)

একে রবীন্দ্রনাথ বলেছে—এক চরণ । অমূল্যধন বলেছেন—দুই চরণ । এ

সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—“আমার বক্তব্য এই লেখার পঙ্ক্তি এবং ছন্দের পদ এক নয় । আমাদের হাঁটুর কাছে একটা জোড় আছে বলে আমরা প্রয়োজন মতো পা মূড়ে বসতে পারি, তৎসত্ত্বেও গণনায় ওটাকে পা বলে স্বীকার করি এবং অনুভব করে থাকি । নইলে চতুঃপদের কোঠায় পড়তে হয় ।”

রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি যুক্তিযুক্ত বলেই আমাদের বিশ্বাস । পর্ব ও পর্বাঙ্গবাদের ওপর ভিত্তি করে চলা সর্বত্র চলে না । কারণ—প্রথম পঙ্ক্তির মধ্যে কবির বক্তব্য পরিস্ফুট হয়নি, হয়েছে দ্বিতীয় পঙ্ক্তিকে অবলম্বন করে—সুতরাং দু’টো মিলে এক হবে ।

পর্ব ও পর্বাঙ্গ : (Bar and beat চরণের যেখানে অর্ধযতি পড়ে সেই

অংশগুলোকে পর্বাঙ্গ বলা হয়—

১১ ১ ১১ ১ ১১ ১১ ১১ ১ ১১

সকাল বেলা / কাটিয়া গেল / বিকাল নাহি / যায়

সকাল বেলা—পর্ব ; কাটিয়া গেল—পর্ব ; বিকাল নাহি—পর্ব প্রতিটি পর্বের

মাত্রা সংখ্যা—৫ ।

কিন্তু ‘যায়’ এর মাত্রা সংখ্যা—২ । সুতরাং পূর্ণাঙ্গ পর্ব নয় । এই অ-পূর্ণাঙ্গকে বলা হয়—অপূর্ণ পর্ব ।

পর্ব, অপূর্ণ পর্ব ছাড়াও মাঝে মাঝে পদ্যে “অতিপর্ব” পাওয়া যায় । অপূর্ণ থাকে শেষে । এবং অতিপর্ব থাকে আদিতে—

রব গোধূলি সময় / বেলি

ধনি মন্দির বাহির / ভেলি ।

‘রব’ ও ‘ধনি’ = অতিপর্ব ।

‘গোধূলি সময়’ এবং ‘মন্দির বাহির’ = পর্ব ; বেলি, ভেলি = অপূর্ণ পর্ব
সুতরাং বলা যেতে পারে—অতিপর্ব + পর্ব + অপূর্ণ পর্ব = চরণ। বাংলা ছন্দ
বিচারে পর্বের গুরুত্ব অনেক—একথা অমূল্যধন বার বার করে বলেছেন। তিনি
বলেছেন যে পর্বের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে বাংলা ছন্দের গতি ও প্রকৃতি
নির্ভর করে এবং যারা ‘পর্ব’ এর ওপর নির্ভর না করে ছন্দের গতি ও প্রকৃতি নির্ণয়
করেন—অমূল্যধনের মতে তাঁরা ছন্দের মূল বস্তুটি ধরতে পারেন নি।

রবীন্দ্রনাথ পর্ব পর্বের ওপর কোনো গুরুত্ব দেন নি। তিনি ছন্দের জাত
নির্ণয় করার ক্ষেত্রে ‘চালের’ দিকে জোর না দিয়ে ‘চলনের’ দিকে গুরুত্ব দিয়েছেন।
তিনি বলেছেন—“পৃথিবীর আর্থিক এবং বার্ষিক গতির মতো কাব্যে ছন্দের আবর্তনের
দুটি অঙ্গ আছে, একটি বড় গতি আর একটি ছোট গতি। অর্থাৎ ‘চাল’ এবং ‘চলন’।
প্রদীক্ষণ এবং পদক্ষেপ।” তিনি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন—

১	২	৩	৪
শারদ চন্দ	পবন মন্দ	বিপিন ভরল	কুসুমগন্ধ
৫	৬	৭	৮
ফুল মল্লি	মালতি যুথি	মন্তমধুপ	ভোরণী

তিনি বলেছেন—“প্রদীক্ষণের মাত্রার চেয়ে পদক্ষেপের মাত্রার পরেই ছন্দের
বিশেষত্ব বেশি নির্ভর করছে। কেননা এই আট পদক্ষেপের আবর্তন সকল ছন্দেই চলে।
বস্তুত এইটেই হচ্ছে অধিকাংশ ছন্দের চলিত কায়দা। যথা—

১	২	৩	৪
মহা ভার	তের কথা	অমৃত স	মান
৫	৬	৭	৮
কাশীরাম	দাস কহে	শূনে পূণ্য	বান

এরও আট পদক্ষেপ।

ছন্দের মাত্রা নির্ধারণ পদ্ধতি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ অমূল্যধনের সঙ্গে একমত হতে
পারেন নি—

আঁধার রজনী পোহাল

জগৎ পূরিল পূলকে।

রবীন্দ্রনাথের মতে এই গানটি নয় মাত্রার ছন্দে রচিত (৩+৩+৩)।
অমূল্যধনের মতে এ হচ্ছে ছয় মাত্রার—অর্থাৎ তিনি বলেছেন—

৬ ৩

আঁধার রজনী / পোহালো = ৯।

পব' ছন্দে
 তি' প্রকৃতি
 নির্ণয়
 রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—যে “এর পদ্যভাগ নয় মাত্রার এবং আংশিক ভাগ হচ্ছে
 ৩+৩+৩। এই গানটির পদ্যরূপবর্তন ঘটেছে নয় মাত্রার পর। যেমন একটি বাহু—
 তারও তিনটি পব' (অংশ) রয়েছে—মণিবন্ধ পর্যন্ত এক, এটি ছোট পব', কনুই পর্যন্ত—
 দুই, কনুই থেকে কাঁধ পর্যন্ত—তিন। সব মিলে বাহু অর্থাৎ তিনের যোগফল
 দাঁড়াচ্ছে বাহু। আমাদের এক বাহু আর এক বাহুর পদ্যরূপবর্তি মাত্র। —“অধার
 রজনী পোহালা” গানটির পদ্যরূপবর্তি হচ্ছে অর্থাৎ সম এসে দাঁড়াচ্ছে নয় মাত্রার পর।

র জা
 ছেন।
 ত'নের
 চলন'।
 মাত্রা বিচারে রবীন্দ্রনাথের মতে বাংলা ছন্দ তিন জাতের—সমচলনের ছন্দ,
 অসমচলনের ছন্দ এবং বিষম চলনের ছন্দ। দু'মাত্রার চলনকে ‘সম মাত্রা’র ছন্দ,
 ‘তিন মাত্রা’র চলনকে ‘অসম মাত্রা’র এবং দুই-তিনের মিলিত মাত্রার চলনকে
 ‘বিষম মাত্রা’র ছন্দ হিসাবে তিনি ধরেছেন—

ফিরে ফিরে আঁখি নীরে পিছু পানে চায় ৬৪ ৩৭

পায়ে পায়ে বাধা পড়ে চলা হল দায়। ১৪

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—“এই হল দুই মাত্রার চলন। দুই বা গুণফল চার বা
 আটকেও আমরা একই জাতের গণ্য করি।

যাঁরা ছন্দ বিচারে রবীন্দ্রনাথের মতবাদকে স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠাবোধ করেছেন,
 তাঁরা ঐ চরণ দুটোকে এমনি ভাবে পব' বিভাগ করেছেন—

ফিরে ফিরে আঁখি নীরে / পিছু পানে চায় = ৮ + ৬ = ১৪

পায়ে পায়ে বাধা পড়ে / চলা হল দায় = ৮ + ৬ = ১৪

অসম ছন্দ : (তিন মাত্রার)

৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ২

নয়ন / ধারায় / পথ যে / হারায় / চায় সে / পিছন / পানে

চলিতে / চলিতে / চরণ / চলে না / ব্যথার / বিষম / টানে

হতে
 বিষম মাত্রার ছন্দ :

৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ২

যতই চলে / চোখের জলে / নয়ন ভ'রে / ওঠে

চরণ বাধে / পরাণ কাঁদে / পিছনে মন / ছোটে।

শুবক : (Stanza) দুটো বা তার বেশি চরণ সুন্দর ও সার্থকভাবে পরস্পর
 সন্নিবিষ্ট হ'লে তাকে শুবক বলা হয়। বাংলা কবিতায় দুই থেকে দশ চরণের শুবক

দেখতে পাওয়া যায়। প্রতিটি শব্দকে কবিতার ভাবটি অন্ততঃ আংশিক ভাবে বিধৃত
হয়ে থাকে।

“নয়নের সলিলে যে কথাটি বলিলে
রবে তাহা স্মরণে জীবনে ও মরণে।” (দুই চরণের শব্দক)

“আকাশের ওই আলোর কাঁপন
নয়নেতে এই লাগে
সেই মিলনের তিঁড়ি-তাপন
নিখিলের রূপে জাগে।”
(চার চরণের শব্দক)

মাত্রা : (Mora) বাংলা অক্ষরের যেমন ‘ধ্বনিগৌরব’ (accent) রয়েছে
ঠিক তেমনি ‘মাত্রাগৌরব’ও রয়েছে। বাংলা ছন্দ মাত্রাগত। যাকে ইংরাজীতে বলা
যেতে পারে Quantative। এই মাত্রা হল সময় বা কাল পরিমাণ, অর্থাৎ একটি
অক্ষর উচ্চারণ করতে যে সময়ের প্রয়োজন সেই অনুযায়ী অক্ষরের মাত্রা নির্ধারণ
করা হয়। তবে একথা স্মরণ রাখতে হবে যে সংস্কৃত-উচ্চারণে ধ্বনির দীর্ঘত্বস্বতা
স্থির নির্দিষ্ট। বাংলাতে তা নয়। সেজন্য সংস্কৃত ছন্দ কেবলমাত্র পদক্ষেপের মাত্রা
গুণেই নিশ্চিত নয়, নির্দিষ্ট নিয়মে দীর্ঘত্বস্ব মাত্রাকে সাজাতে হয়—তবেই তাতে
ছন্দ জাগে।

অক্ষরের মাত্রা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে বাংলা অক্ষরের
মাত্রা বাঙালী মেয়েদের চুলের মতো, কখনো আঁট করে বাঁধা আবার কখনো এলো
খোঁপা। তাই আবার বলেছেন “অক্ষরের সংখ্যা গণনা করে ছন্দের ধ্বনি মাত্রা গণনা
বাংলায় চলেনা”—যেমন—

“মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া উৎকট
হঠাৎ ফুকারি উঠে—হিং টিং ছট্।”

এই পঙ্ক্তি দুটোর পর্ব করে দেখান হচ্ছে—যে এখানে অক্ষরের সংখ্যা গণনা
করে ছন্দের মাত্রা গণনা চলেনি—

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২

“মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস / ছাড়িয়া উৎকট

হঠাৎ ফুকারি উঠে / হিং টিং ছট্ ॥”

প্রথম পঙ্ক্তিটিতে রয়েছে—১৫টি অক্ষর

দ্বিতীয় পঙ্ক্তিটিতে রয়েছে—১২টি অক্ষর (‘ৎ’ বাদে) এর মাত্রা গণনা হবে এই ভাবে—প্রথম পঙ্ক্তির প্রথম পর্বে ৮ মাত্রা, এবং দ্বিতীয় অপূর্ণ পর্বের মাত্রা হবে—৬; ছাড়িয়া=৩; উৎ—উচ্চারণে ‘ৎ’ এর কোনো প্রাধান্য নেই ফলে উৎ=১; ক’ট=২=৩।

দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতে ব্যতিক্রম রয়েছে—১ম পর্বে ‘ৎ’ এর উচ্চারণ পূর্ববর্তী অক্ষরের সঙ্গে জড়িয়ে যায়নি এবং ‘ৎ’ উচ্চারণের পরেও একটু রেশ রয়ে গিয়ে—

১১ ১ ১১ ১ ১১
হ ঠাৎ = ৩ হল, ফুকারী = ৩, উঠে = ২ মোট ৩+৩+২=৮।

হিং টিং ছট্ (অক্ষরবৃত্তে, ‘ৎ’ এর মাত্রা সাধারণতঃ দেওয়া হয় না)।

“উৎসব শেষে মৃৎপাত্রের মতো যাও ফেলে”

এখানেও ‘উৎ’=১ মাত্রা, আবার ‘মৃৎ’ দুই মাত্রা।

এখানে ‘হিং’ ‘টিং’ সব দু’মাত্রার মূল্য পেয়েছে—অর্থাৎ খোঁপা এখানে “এলো খোঁপা” এবং ছট্=২ মাত্রা মোট ৬ মাত্রা।

৮+৬=১৪; ৮+৬=১৪=অক্ষরবৃত্ত, তান প্রধান বা মিশ্রকলাবৃত্ত, ধীর লয়ের ছন্দ। দ্বিপদী, লঘু পয়ার।

মাত্রা পদ্ধতি : এ সম্পর্কে কয়েকটি মূলনীতি মনে রাখতে হবে—

- (১) কোনো পর্বাস্ত্রে একাধিক প্রভাব মাত্রিক অক্ষর যেন না থাকে (এখানেও ব্যতিক্রম রয়েছে—“দেশ দেশ নন্দিত করি” এখানে ‘দে’+‘দে’ দুটোর উচ্চারণই প্রভাব-মাত্রিক)।
- (২) প্রভাব-মাত্রিক অক্ষরের সঙ্গে বিপরীত গতির অক্ষর একই পর্বাস্ত্রে বসতে পারবে না অর্থাৎ একই পর্বাস্ত্রে অতিদ্রুত অক্ষরের সঙ্গে বিলম্বিত বা অতিবিলম্বিত এবং অতি বিলম্বিতের সঙ্গে ধীর দ্রুত ব্যবহৃত হতে পারবেনা (তবে একথা স্মরণ রাখতে হবে যে যাঁরা জাত কবি তাঁদের রচনা বা শব্দ চয়ন স্বতঃস্ফূর্ত—“পৃথগ যত্ননিবর্তা” নয়) রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

“অন্তর হতে আহরি বচন

আনন্দলোক করি বিরচন

গীত রস ধারা করি সিঞ্জন” এর মধ্যে ছন্দের ব্যাকরণ থাকবে পেছনে পেছনে—“দাসীর” মতো।

মাত্রা বিচার : ছন্দে মাত্রা হিসাব করতে হ’লে নিচে দেওয়া কথা কয়টি মনে রাখতে হবে—

- (১) সব কবিতা একই লয়ের নয়—কোনোটা ‘দ্রুত লয়ের’ কবিতা, কোনোটা ‘ধীর লয়ের’

কবিতা আবার কোনো কোনো কবিতা বিলম্বিত লয়ের কবিতা। যেমন গানের লয় হিসেবে “তাল” ঠিক করা হয় (কাহারবা, ডিমে তেতালা, দ্রুত তেতালা), ঠিক তেমনি লয় ধরে কবিতার ‘জাত’ ঠিক করে মাত্রা নির্দ্ধারিত করতে হবে।

(২) পর্বঙ্গ বিন্যাসে যে রীতি রয়েছে—তাকেও অনুসরণ করতে হবে— $৩+৩+২=৮$ কে $৩+২+৩=৮$ করতে গেলে ছন্দ পতন হবে। অর্থাৎ ‘তাল’ তলা দিয়ে যেতে হবে—‘তাল’ তলিয়ে দিয়ে নয়।

(৩) অমূল্যধনের মতে শব্দকে না ভেঙে আস্ত রেখে পর্ব-বিভাগ করা উচিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তা মানেনি। তাঁর মত হচ্ছে প্রয়োজন বোধে শব্দকে ভেঙেও পর্ব ভাগ করতে হবে। শেষ পর্যন্ত অমূল্যধনও বাধ্য হয়েছেন—শব্দকে ভেঙে পর্ব বিভাগ করতে। আনন্দ মোহন বসু তাঁর বাংলা পদাবলীর ছন্দ গ্রন্থে শব্দকে ভেঙে পর্ব বিভাগ করেছেন, যেমন—

৫ ৫ ৫ ২
সাগর জলে / সিনান করি / সজল এলো / চুলে
বসিয়াছিলে / উপল উপ / কুলে। (রবীন্দ্রনাথ)

কি পেখলু / গোর কি : শো-র। ১১
সুন্দরধনি / তীরে উ : জো-র ॥ ১১ (আনন্দ মোহন বসু)

তেজিয়া কা : লিন্দী তীর // কদম্ব বি : লাস=১৪
এবে সিন্ধু / তীরে কেনে // কিবা অভি : লাস=ঐ
(আনন্দ মোহন বসু।)

৪ ৪ ৪ ২
ঘুম্ যাবে সে / দুধের ফেনা / ফুলের বিছা / নায়
রেল গাড়ি ধায় / হেরিলাম হাস / নামি বন্ধ / মানে

কোথায় শিষ্য / ভুলেছ ভাষ্য / মাধবীর সৌ / রভে।

(অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় / বাংলা ছন্দের মূল সূত্র পৃঃ ৪৯)

ছন্দের মাত্রা বিচার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মত হচ্ছে যে ছন্দের মাত্রা নিরূপণ করতে হবে কবিতা পড়ে, কান পেতে, নিয়ম পেতে নয়—তিনি বলেছেন—“আমার নিজের বিশ্বাস যে, আমরা ছন্দ রচনা করি স্বতঃই কানের ওজন রেখে, বাজারে প্রচলিত কোনো বাইরের মানদণ্ডের দ্বারা মেপে এ কাজ করিনে, অন্তত সজ্ঞানে নয়।” এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রবোধ চন্দ্র সেন মহাশয়ের মতবৈধ রয়েছে। প্রবোধ চন্দ্রের এক

সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—“প্রবোধ চন্দ্র সেন এই বলে আমাদের দোষ দিয়েছেন যে—আমরা একটা কৃত্রিম মানদণ্ড দিয়ে, পাঠকের কানকে ফাঁকি দিয়ে, তার চোখ ভুলিয়ে এসেছি, আমরা ধ্বনি চুরি করে থাকি অন্ধরের আড়ালে।” তা যে নয়, তা উদাহরণ (‘ছন্দ’ বইয়ে) দিয়ে বিষয়টিকে পরিষ্কার করে দিয়েছেন—

+
উদয় দিগন্তে ঐ শূভ্র শঙ্খ বাজে ।

+ ।
মোর চিত্ত মাঝে

+
চির নূতনেরে দিল ডাক

।
পশ্চিমে বৈশাখ ।

।=এক মাত্রা + = দুই মাত্রা ।

রবীন্দ্রনাথ ‘উদয়’ কে তিন মাত্রা ধরেছেন এবং ‘দিগন্ত’কেও ৩ মাত্রা ধরেছেন । ‘উদয়’এর ‘অয়’=২ মাত্রা, ‘দিগন্ত’ এর অন=১ মাত্রা । এই মাত্রা বিচারের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

- (১) বাংলায় স্বরবর্ণ সংস্কৃত বানানের হ্রস্বদীর্ঘতা মানে না ।
- (২) বাংলায় তার একটা নিজস্ব নিয়ম রয়েছে ।
- (৩) বাংলায় হ্রস্ব শব্দের পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘ হয়—জল, (জ+অ+ল), চাঁদ (চাঁ+আ+দ) । এই রীতি গোড়া থেকেই চলে আসছে ।

প্রবোধ চন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ‘ঐ’ এবং ‘ওই’ বানান নিয়েও আপত্তি তুলেছেন । তার উত্তরেও রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

“ওই দেখো, থোকা ফাউন্টেন পেন মুখে পুরেছে”

এখানে দীর্ঘ ওকারে কেউ দোষ ধরবে না । আবার যদি বলি—‘ঐ দেখো, থোকা ফাউন্টেন পেনটা খেয়ে ফেললে বৃষ্টি’ তখন হ্রস্ব ‘ঐ’কার নিয়ে বচসা করবার লোক মিলবে না । বাংলা উচ্চারণে স্বরের ধ্বনিতে টান দিয়ে অতি সহজেই বাড়ানো-কমানো যায় বলেই ছন্দে তার গৌরব বা লাঘব নিয়ে আজ পর্যন্ত দলাদলি হয়নি” । অর্থাৎ খোঁপাকে কখন ‘এলো’ কখনো ‘টাইট’ করে চলার মতই ।

১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০

১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০

১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০

১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০

১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০

১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০

১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০

১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০

১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলা ছন্দের বৈশিষ্ট্য

বাংলা ছন্দের বিচার ও বিশ্লেষণ করে দেখে বিশেষজ্ঞেরা যে কয়টি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন—তা নিচে দেওয়া হল—

- ১) বাংলায় অক্ষরের দৈর্ঘ্য অথবা মাত্রা হিসেব করেই ছন্দোবিন্যাস হয় থাকে।
- ২) বাংলা ছন্দ মাত্রাসমক-জাতীয়—অর্থাৎ প্রত্যেকটি বিভাগে মোটামুটি একটা পরিমিত মাত্রা থাকা দরকার।
- ৩) বাংলা ছন্দ বৈচিত্র্যের চেয়ে ঐক্যের প্রাধান্যই বেশি করে দেখতে পাওয়া যায়।
- ৪) প্রস্থাসের ঝাঁকের মাত্রাই বাংলা ছন্দের একটি বিশেষ সম্পদ।
- ৫) প্রতি সমতা (Symmetry) বাংলা ছন্দের একটি প্রধান গুণ; বাংলা ছন্দের আদর্শ—জোড়ায় জোড়ায় ছন্দোবিভাগগুলোকে সাজানো। এরই ফলে দ্রুতের গুণগত ফল দাঁড়ায় গিয়ে চারে। এবং এই সংখ্যাগুলোরই প্রাধান্য দেখতে পাই বাংলা ছন্দে।
- ৬) সাধারণতঃ বাংলা কবিতায় চরণে দুই বা চার পদ থাকে।
- ৭) বাংলার চির প্রচলিত বর্ণমাট্রিক ছন্দে পদ মধ্যস্থ হলন্ত অক্ষরকে দ্বিমাট্রিক ধরা হয় না।
- ৮) বাগ্‌যন্ত্রের আরামপ্রিয়তার জন্য ষোণিক অক্ষর থাকলেই বাগ্‌যন্ত্রকে একটু বিরাম দেওয়া হয়ে থাকে—অতি ভৈরব = অ + তি + ভৈ(ই) + র + ব।
- ৯) বাংলা মাট্রিক ছন্দেও সংস্কৃতের মতো হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরের ব্যবহার নেই—যদিও একমাট্রিক দ্বিমাট্রিক অক্ষরের ব্যবহার আছে।
- ১০) স্বরমাট্রিক ছন্দে স্বরের প্রাধান্য বেশি—সেখানে অক্ষরের ওপর সন্দৃপ্ত শ্বাসাঘাত পড়ে—ফলে দ্রুতজাতের অক্ষরের অস্তিত্ব অনুভূত হয়।
- ১১) বর্ণমাট্রিক ছন্দে যেখানে যুক্তাক্ষর সন্দৃপ্তকোশে প্রয়োগ করা হয়েছে—সেখানে কিছুটা সংস্কৃত বৃত্তছন্দের মতো মন্দর, গভীর ও উদার ভাবের সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়—“সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর স্মরিতা শংকরে।” অথবা “কিম্বা বিম্বাধরা

রমা অম্বদ্রাশি তলে” প্রভৃতিতে একটা গাম্ভীৰ্য দেখা দিগ্নেছে। এ ছন্দে পদমধ্যস্থ হলন্ত অক্ষরকে দ্বিমাত্রিক ধরা হয় না, এখানে কোনো রকম বিরামের অবসর থাকে না—সদুতরাং ব্যঞ্জন বর্ণের একটা সংঘাত অনদ্ভূত হয়।

১২) বাংলা ছন্দে যতির অবস্থান এবং তার জন্য ছন্দোবিভাগে একটা ঐক্য দেখতে পাওয়া যায়।

১৩) বাংলায় প্রতিষম ছন্দোবিভাগগুলো সাধারণতঃ এক ছাঁচে হয় না।

১৪) বাংলা উচ্চারণে সাধারণতঃ খোঁচ-খাঁচ কম সদুতরাং কোনো একটি ছাঁচে ফেলে পর্ব বা পর্বঙ্গ গঠন করা কঠিন হয়ে পড়ে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এক একটা ছাঁচ অবলম্বন করে কবিতা রচনা করেছেন, কিন্তু সব সময় সমতা রক্ষিত হয়নি।

১৫) শ্বাসাঘাতযুক্ত ছন্দে মাত্র এক ছাঁচের পর্বই চালু। ছাঁচ বদলে গেলেও ছন্দের হানি হয় না—

“মঙ্গল : বুলবুল / বনফুল : গন্ধে
বিলকুল : অলিকুল / গুঞ্জরে : ছন্দে”

এ পঙ্ক্তি দুটোতে পর্বের ছাঁচ এক নয়, দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতে ছাঁচ বদলে দেওয়া হয়েছে—তথাপি পড়বার সময় ছাঁচের পরিবর্তন বিশেষ ভাবে অনদ্ভূত হয় না। পর্ব ও পর্বঙ্গে সংখ্যা ও মাত্রা সমান রয়েছে বলে ছন্দের ঐক্যবোধ রয়েছে—এবং বৈচিত্র্যের আভাষ পাওয়া যায় না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে

বাংলা ছন্দ

(প্রাক্ রবীন্দ্রনাথ)

বৈষ্ণব পদাবলীতে বাংলা ছন্দে যে ঢেউ উঠেছিল—তা সুন্দর প্রসারী এবং সেই ঢেউ এসে পড়েছে রবীন্দ্র-কাব্য সাগরে । তবে অষ্টাদশ শতাব্দীতে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র কিছন্দ সংস্কৃত ছন্দকে বাংলার ছন্দভূমিতে বপন করে কিছুটা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছেন । এমন কি গ্রাম্য সুরেও কিছুটা নোতুনত্ব এনেছেন—

ধামালী :

“উমার কেশ চামর ছটা
তামার শলা চুড়ায় জটা,
তায় দেখিয়া ফোঁফায় ফণী

দেখে আসে জ্বর লো”

এই ধামালী জাতীয় ছন্দেই ফুটেছে আধুনিক স্বাসাঘাত বা স্মরাঘাত প্রধান ছন্দের রূপ-বৈচিত্র্য । বস্তুত একে ধামালী না বলে স্বাসাঘাত প্রধান ছন্দ বলাই শ্রেয় ।

“আমার উমা মেয়ের চুড়া ভাঙ্গড় পাগল ওই না বড়ু,

ভারত কহে, পাগল নহে, ওই ভুবনেশ্বর লো” ॥

মালঝাঁপ : এই ছন্দে মোট চারটি পর্ব থাকে, তন্মধ্যে প্রথম তিনটি পর্বের অন্ত্যে মিল থাকবে এবং শেষ পর্বটি থাকবে ম্লগ্—

“কোতোয়াল যেন কাল খাঁড়া ঢাল ঝাকে

ধরিবাণ খরশাণ হানাহান হাঁকে ।”

ভুজঙ্গ প্রয়াত : সংস্কৃত ভুজঙ্গ প্রয়াতের অনুসরণে—

“ভুজঙ্গ প্রয়াতে কহে ভারতী দে ।

সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে ।”

তুপক :

“মৈল দক্ষভূত যক্ষ সিংহনাদ ছাড়িছে

ভারতের তুণকের ছন্দোবন্ধ বাড়িছে।”

“ছন্দোবন্ধ বাড়িছে”—কবির এই উক্তি সর্বৈবভাবে সত্য। এই সাফল্যে বাংলা কাব্যের গৌরব বৃদ্ধি পেয়েছে, ঐশ্বর্যও বেড়েছে। পয়ার-লাচাড়ীর বাঁধাধরা প্রয়োগে বাংলা কাব্যের গঠন-রীতি যে ভাবে শিথিল হয়ে পড়তে সুরু করেছিল, ভারতচন্দ্রের হাতে আবার জোয়ার এসেছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতচন্দ্রের পর আর সেরকম প্রতিভাধর কবির আবির্ভাব ঘটেনি। তখন কবিওয়ালার যুগ সুরু হয়।

রাম প্রসাদ : সাধক-কবি রাম প্রসাদের কাব্যে ছড়ার ছন্দ দেখতে পাই—

“শিব যদি হয় / সত্যবাদী

তবে কি তো : মা-র সাধি

(মা গো, ওমা) ফাঁকির উ : পরে ফাঁকি

ডা-ন চক্ষু / নাচে” ৪/৪/৪/৪/৪/২

“জাক্ জমকে / করলে পূজা // অহংকার হয় / মনে মনে

(তুমি) লুকিয়ে তারে / করবে পূজা // জানবে নারে / জগজ্জনে” ॥

বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মদ্রসলমান কবিদের রচনায়ও শ্বাসাঘাত ছন্দের কবিতার নিদর্শনের অভাব নেই—

“যখন আমি / বৈসা থাকি // গুরুজন্যার / কাছে

(তুমি) নাম ধৈরা / বাজাও বাঁশী // আমি মরি / লাজে।”

শক্তিপূজার জয়স্রোত রচনাতেও মদ্রসলমান কবির ছড়ার ছন্দ প্রয়োগ করেছেন—

“দোহাই লাগে / হ্রিপদুরারী যদি কর / জোর জবরি

সামনে আছে / জজ্কাছারী

আইনের মত / রসিদ দিব

জামিন দিব / হ্রিপদুরারী।”

(মিরজা হোসেন আলী)

বাউল সাধকেরাও এই ছন্দ প্রয়োগ করেছেন—

“খাঁচার ভিতর / আঁচন্ পাখী // কেমনে আসে / যায়

ধরতে পারলে / মনবেড়ী // দিতাম্ তাহার / পায়” ৪/৪/৪/২

“চপ কীর্তনে”ও শ্বাসাঘাত ছন্দের প্রয়োগ রয়েছে—

“রাজ্জন্মিনী / পড়লো ধরায়

(ওমা) তোরা ধরু আর / ধরু আর

কমলিনী / আর গো তোরা / এরাই যেন / যায় মথুরায়।”

উনবিংশ শতাব্দী

(বাংলা ছন্দ)

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কবির গোষ্ঠীপতি ছিলেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে বিষ্ণু চন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিষ্ণু চন্দ্র তাঁর কাব্য জীবন সূর্য করেন কবিতা লেখা দিয়ে এবং ‘ললিতা ও মানস’ তাঁর প্রথম ও শেষ কাব্য। তবে তিনি তার উপন্যাসে কিছু বৈষ্ণবপদ (ব্রজবুলিতে) গান হিসেবে রচনা করেছিলেন। দীনবন্ধু নাট্যকার হিসাবে খ্যাতি লাভ করলেও তাঁর গদ্য ও পদ্য দুই ছিল।

ঈশ্বর গুপ্ত নবীন কবিদের কাব্য রচনায় উৎসাহ দিতেন এবং তাঁর সম্পাদিত “সংবাদ প্রভাকরে” নবীন কবিদের লেখা ছাপতেন। নিজেও ছিলেন কবি। তিনি বাংলার কবি এবং বাঙালীমানার বিশুদ্ধ কবি ছিলেন, উপরন্তু ছিলেন মেকীর ওপর চটা। বিলাতী আচার বিচারের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। এবং যে সব বাঙালী, সাহেবদের অনুকরণ করতেন তাঁদের তিনি ব্যঙ্গবাণে বিধ্বস্ত করতেন। পন্নার, দ্বিপদী, (অক্ষরবৃত্ত) ছাড়া তিনি হাস্যরস সৃষ্টির জন্য ছড়ার ছন্দে কবিতা লিখেছেন—

“আগে মেয়ে / গুলো ছিল / ভালো

রতধর্ম / কোণ্টা সবে

একা বেথুন / ক্রমে শেষ ক / রেছে

আর কি তাদের / ভেমন পাবে।”

ধিস্তা ধিনা পাকালোনা ছন্দ—

“নোড়বো না তো, / লোড়বো স্নুখে

পোড়বো রুকে / চোড়বো বুরুকে ।

শত্রু যদি / আসে ঝুঁকে

থাব্‌ড়া কোষে / মাষ' বুরুকে ।

জোমকে আমি / বোলবো যবে

চোমকে যাবে / দেবতা সবে ।”

অথবা

কেমন পুকুর / কেমন কুকুর / কেমন হাতের / কোড়া

কেমন এ ঘাড় / কেমন এ ছাড়ি / কেমন ফুলের / তোড়া

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা কাব্যে যেমন যুগান্তর এনেছেন, ঠিক তেমনি বাংলা ছন্দের ক্ষেত্রে যুগান্তর এনেছেন। তিনি বাংলা ছন্দ পয়্যারের বোড়ি ছিন করে Milton এর Blank Verse এর অনুসরণে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করেন।

অমিত্রাক্ষর ছন্দ বিদেশি-প্রভাবজাত সন্দেহ নেই কিন্তু বিদেশি বস্তু নয়, আসলে এ পয়্যার ছন্দ। পার্থক্য হচ্ছে—পুরানো পয়্যারে যেমন দুটো চরণে শেষ যতি পড়ে, অমিত্রাক্ষরে তা নয়। উপরন্তু পদান্তে অন্ত্যশনুপ্রাস পয়্যারে থাকে—অমিত্রাক্ষরে তা থাকে না। পয়্যারে মিলের বন্ধনীতে দুই চরণের মধ্যে বাক্য শেষ করতে হবে, অমিত্রাক্ষরে তা করা হয় না।

মধুসূদন তাঁর “তিলোত্তমা সম্ভব” কাব্যেই প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগ করেন তবে এই কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগে দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারেন নি, মেঘনাদে তা পূর্ণবিকশিত হলেও মাঝে মাঝে ছন্দ পতন হয়েছে কিন্তু বীরাঙ্গনা কাব্যে ছন্দ একেবারে টুটিছিন্ন।

রজাঙ্গনা কাব্যের ছন্দে মধুসূদন যে স্বাধীনতা দেখিয়েছেন—যতি সংখ্যায়, ছত্র সংখ্যায়, মিলে এবং মাত্রাবৃত্তের ব্যবহারে—সে স্বাধীনতা অমিত্রাক্ষর পয়্যার-প্রবর্তনের চেয়ে কোনো অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বাংলার প্রথম ‘ওড়’ অর্থাৎ অসমচরণ লিরিক কবিতা-হিসেবেও রজাঙ্গনার ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে—

যতি সংখ্যার ও মিলে—

হে মহি, এ অবোধ পরাণ

কেমনে করিব স্থির, কহ গো আমারে

যতি সংখ্যার ও মিলের স্বাধীনতা—

“হে মহি, এ অবোধ পরাণ

কেমনে করিব স্থির, কহ গো আমারে

বসন্ত বিহনে।”

ছত্র-সংখ্যার স্বাধীনতা :

কেনে এত ফুল তুলিলি সজনি—

ভরিয়া ডালা ?

মেঘাবৃত হলে, পরে কি রজনী

তারার মালা ?

আর কি যতনে, কুসুম রতনে

রজের বালা ?

মাত্রারূপের ব্যবহারে—

সখিরে

বন অতি রমিত হইল ফুল ফুটলে

পিককুল কলকল, চঞ্চল অলিদল

উছলে সুববে জল

চল লো বনে।

চল লো, জুড়াব আঁখি দেখ ব্রজরমণে।

মধুসূদনের অপর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—চতুর্দশপদী কবিতা (Sonet)। এক্ষেত্রে

তিনি পেট্রার্ক্যা, মিল্টন সেক্সপীয়রের অনুকরণ করেছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অক্ষর বৃত্ত

অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে তানপ্রধান বা ধীর লয়ের ছন্দ বলা হয়। প্রবোধচন্দ্র এর নাম দিয়েছেন “মিশ্রকলাবৃত্ত” ছন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ এর নামকরণ করেছেন “সাধু-বাংলার ছন্দ”। এই ছন্দের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—

- ক) স্বরের হ্রস্ব বা দীর্ঘ বিচারের কোনো অবকাশ নেই।
- খ) অক্ষরবৃত্তে প্রতিটি অক্ষর একমাত্র। তবে রবীন্দ্রনাথ একথা স্বীকার করেন না।
- গ) যদি কোনো শব্দের শেষে হলন্ত বা ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর থাকে তাহলে দু’মাত্রার হবে, তবে সর্বত্র এ নীতিও অনুসৃত হয়নি। হলন্ত অক্ষরকে একমাত্রা ধরে উচ্চারণ করতে গেলে উচ্চারণ কিছু দ্রুত হওয়া দরকার। কিন্তু তাতে স্বর-গাম্ভীৰ্য কমে আসে, এবং এটা হওয়া সম্ভব নয়, কারণ এতে স্বাভাবিক উচ্চারণের বিরোধী হয়ে পড়ে, সুতরাং পয়ার জাতীয় ছন্দে অন্তিম হলন্ত অক্ষরকে একমাত্রা না ধরে দু’মাত্রা ধরাই উচিত।
- ঘ) এই ছন্দে অক্ষর-ধ্বনির চেয়ে সুরের প্রবাহ চরণের মধ্যে বিচিত্র ভাবে প্রকাশ লাভ করে।
- ঙ) এই ছন্দে যেমন যুক্তাক্ষর বর্জিত চরণ রচনা করা যায় তেমনি যুক্তাক্ষর-বহুল চরণ রচনা করতে কোনো বাধার সৃষ্টি হয় না।
- চ) হ্রস্ব দীর্ঘস্বরের যেমন সংকোচন-প্রসারণ ঘটে তেমনি যুক্তধ্বনিতেও সংকোচন-প্রসারণ ঘটে।
- ছ) এই ছন্দের তানপ্রবাহের জন্যে লঘুগুরু অক্ষরের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যও দেখতে পাওয়া যায়।
- জ) এই ছন্দে স্থৈর্য ও গতি পাশাপাশি থাকার ফলে কিছুটা গতি মন্থরতা এসেছে।
- ঝ) গাম্ভীৰ্য ও সংযম বেশি থাকায় এই ছন্দে শুদ্ধ কবিতা নয় মহাকাব্যও রচিত হতে পারে।
- ঞ) অমিত্রাক্ষর ছন্দের জন্যে অক্ষরবৃত্তের রূপকল্পই বিশেষ ভাবে গ্রহণযোগ্য।

- ট) তৎসম ও অর্ধ-তৎসম শব্দের ব্যবহার করা চলে ।
 ঠ) ং, ঃ, ণ প্রভৃতিকে গণনার বাইরে রাখা হয় । তবে রবীন্দ্রনাথ প্রয়োজনবোধে মাত্রা গণনার ভেতর রাখতে হবেই বলে মন্তব্য করেছেন ।
 ড) টানা সুরের প্রবাহ এই ছন্দের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ।
 ঢ) অক্ষরবৃত্ত পয়ারের ভিত্তিতেই রচিত এবং এর শোষণ শক্তি রয়েছে—একথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ।

পয়ার : বাংলা পয়ারের জন্ম ইতিহাস আগেই দেওয়া হয়েছে । ‘চতুঃপদী’ থেকে এর জন্ম । পয়ার ধীর লয়ের ছন্দ তাই অক্ষরবৃত্ত বা তানপ্রধান বা মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দ । এই ছন্দে সাধারণতঃ স্বভাব মাত্রিক অক্ষরই ব্যবহৃত হয়, আবার লঘু গুরু, তৎসম, অর্ধ-তৎসম সর্বকম অক্ষর দিয়ে গঠিত হতে পারে । পয়ারজাতীয় ছন্দে যে কোনো পর্বঙ্গের পরেই ছন্দ বসান যায়, কেবল উপচ্ছেদ নয়, পূর্ণচ্ছেদও বসান চলে । পয়ারে শব্দের মধ্যে যথেষ্ট ফাঁক রাখা যায় বলেই এরূপ করা চলে ।

সাধারণতঃ পয়ার চোন্দ অক্ষরের দুটো চরণে গঠিত । দুই চরণের শেষে অনুপ্রাস থাকে প্রতি চরণে অষ্টম অক্ষরে অর্ধযতি এবং চতুর্দশ অক্ষরে পূর্ণযতি পড়ে । রবীন্দ্রনাথ এভাবে পর্ব বিভাগ সব সময়ে মানেননি । চোন্দ অক্ষর ঠিক রেখে তিনি পর্ব-পর্বঙ্গ অনেক ভাবে বিভাগ করেছেন । রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—“দুই মাত্রা বা দুই মাত্রার গুণক নিয়ে যে সব ছন্দ তারা পদ্যাতিক, বোঝা সামালিয়ে ধীর পদক্ষেপে তাদের চাল । এই জাতের ছন্দকে পয়ার শ্রেণীর বলব । সাধারণ পয়ারে প্রত্যেক পঙ্ক্তিতে দুটি করে ভাগ, ধ্বনির মাত্রা ও যতির মাত্রা মিলিয়ে প্রত্যেক ভাগে আটটি করে মাত্রা, সুতরাং সমগ্র পয়ারের ধ্বনি মাত্রা সংখ্যা চোন্দ এবং তার সঙ্গে মিলেছে যতি মাত্রা সংখ্যা দুই, অতএব সর্বসমেত ষোলো মাত্রা” । তিনি উদাহরণ দিয়ে তার বক্তব্য পরিস্ফুট করেছেন—

৮

৮

বচন নাহি তো মুখে / তবু মৃদু খানি ০ ০

হৃদয়ে কানে বলে / নয়নের বাণী ০ ০ ।

চোন্দ মাত্রা হলেই যে পয়ার হবে—তাও তিনি স্বীকার করেন নি । চোন্দ মাত্রার কোনো কবিতার চাল যদি **দুলকিচাল** হয় তবে দেখা যাবে যে পয়ারের কোলিন্যা আর বজায় থাকে না—

কেন / তার / মৃদু / ভার / বৃক / ধৃক / ধৃক / ০ ০

চোখ / লাল / লাজে / গাল / রাঙা / টুক / টুক ০ ০

তিনি আরও বলেছেন যে চার মাত্রার ওপর ঝোঁক দিয়ে পয়ার পড়া যেতে পারে—

“সুদর্শবিড় / শ্যামলতা / উঠিয়াছে / জেগে ০ ০

ধরণীর / বনতলে / গগনের / মেঘে” ০ ০

তিনি বলেন যে পয়ারের বদননি ঠাস বদননি নয়, তাকে বাড়ানো-কমানো যায়।
সুদূর করে টেনে পড়বার সময় কেউ যদি যতির যোগে পয়ারের প্রথম ভাগে দশ ও শেষ
ভাগে আট মাত্রা পড়ে তবু পয়ারের প্রকৃতি বজায় থাকে—

১১ ১ ১ ১১

৮

মহাভারতের কথা ০০ / অমৃত সমান ০০

কাশীরাম দাস ভনে ০০ / শূনে পদ্যবান ০০

$১০ + ৮ = ১৮$ দীর্ঘ পয়ার

বিভিন্ন শ্রেণীর পয়ার (কবিতা) রয়েছে। নিচে দেওয়া হল—

(ক) **তরল পয়ার :** চরণের চতুর্থ ও অষ্টম অক্ষরে মিল থাকবে—

দেখ বিজ মনসিজ / জিনিয়া মুরতি

নহে ছবি কহে কবি / সুরে সুরে গাঁথা।

অলো রাই চলো যাই / যমুনার ঘাটে।

(খ) **মালঝাঁপ পয়ার :** চতুর্থ ও অষ্টম ছাড়া দ্বাদশ অক্ষরে মিল থাকে—

জিয়ে রাখি প্রাণ পাখী / কার আঁখি তরে।

রাধা নাম অনুপাম / কহে শ্যাম নিতি।

(গ) **পর্যায়সম পয়ার :** এই পয়ারে প্রথম ও তৃতীয় চরণে এক রকমের
অনুপ্রাস এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে আর এক রকমের অনুপ্রাস (অন্ত্যানুপ্রাস) দেখতে
পাওয়া যায়—

সকলে আমার কাছে / যত কিছুর চায় (ক)

সকলেরে আমি তাহা / পেরেছি কি দিতে (খ)

আমি কি দিইনি ফাঁকি / কত জনে হয় (ক)

রেখেছি কত-না ঋণ / এই পৃথিবীতে। (খ)

(ঘ) **মধ্যসম পয়ার :** এই পয়ারে প্রথম ও চতুর্থ চরণে অন্ত্যানুপ্রাস এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণে আর এক ধরনের অন্ত্যানুপ্রাস থাকে—

গড়নে গহন বটে / রঙেতে সবুজ (ক)

ফুলের স্ববর্ণ নহে / বর্ণচোরা চাঁপা (খ)

বথা তার গন্ধ ভারে / গর্ব ভারে কাঁপা (খ)

ফিরেও চাহে না তোমা / নয়ন অবজ্জ । (ক)

(ঙ) অমিল পয়ার : এই পয়ারে পদান্তে মিল থাকে না। অমিগ্রাফর (অমিল)
পয়ারেরই রূপ কল্প—

সম্মুখ সমরে পড়ি / বীর চূড়ামণি

বীরবাহু, চলি যবে / গেলা যমপুরে

অকালে, কহ হে দেবি, / অমৃত ভাষণী,

কোন বীরবরে বরি / সেনাপতি পদে

পাঠাইলা রণে পুনঃ / রক্ষঃ কুলনিধি

রাঘবারি ? ॥

(চ) ভঙ্গ পয়ার : এই পয়ারে প্রথম চরণে ষোলমাত্রা, দ্বিতীয় চরণে চোদ্দ মাত্রা থাকে এবং প্রথম চরণে প্রথম পর্বের পদনবাবত্তি হবে—

“বিদ্যাপতি মোর নাম / বিদ্যাপতি মোর নাম

বিদ্যাধর-জাতি বাড়ি / বিদ্যাধর গ্রাম ।”

(বর্তমানে এর প্রচলন আর নেই)

(ছ) ষোল মাত্রার পয়ার : এই পয়ারে দুটো করে পর্ব থাকে এবং প্রতিটি পর্ব ৮ মাত্রার—

५

२५

মথুরায় কেন ফুল / ফুটেছে আজ-লো সই

বাঁশরি বাজাতে গিয়ে / বাঁশরি বাজিল কই ?

(জ) দীর্ঘ পয়ার : একে মহাপয়ারও বলা হয়। এই পয়ারের পর্বে মাত্রা সংখ্যা $৮+১০$ ($১০+৮$)

१

20

কোথা রাহি, কোথা দিন / কোথা ফুটে চন্দ্র সূর্য তারা

কেবা আসে কেবা যায় / কোথা বসে জীবনের মেলা ।

(ঝ) **অমিল পয়ার :** এই পয়ারে পদান্তে মিল থাকে না এবং পাবের মাত্র সংখ্যা ৮+১০।

৮

১০

এই কথা ক'ব আমি / তোমারে ভালোবেসেছি আমি
সে নহে স্বপ্ন, কল্পনা / নাইবা তুমি বাসিলে ভালো।

(ঞ) **প্রবহমান পয়ার :** এই পয়ারে অর্থযতি ও ছন্দযতি এক জায়গায় পড়ে না বা মিলে যায় না। ছেদ যতিকে ছেড়ে চলে যায়। ছেদ ও যতির মধ্যে এই বিরোধ মাইকেল মধুসূদন দত্তের অমিত্রহৃদে প্রথম প্রকাশ পায়। পরে রবীন্দ্রনাথের রচনায়ও আমরা পাই—

গ্লান হয়ে এলো কণ্ঠে / মন্দার মালিকা

হে মহেন্দ্র, নির্বাপিত / জ্যোতির্ময় টিকা

মলিন ললাটে ॥

(৮+৬, ৮+৬, ৬)

শোষণ শক্তি : বাংলায় সমগ্রার ছন্দের মধ্যে পয়ার এবং ত্রিপদীই সবচেয়ে বেশি প্রচলিত। এদের উভয়েরই চলন—খুব লম্বা। এদের প্রত্যেক পদক্ষেপ আট মাত্রা। এই আট মাত্রার মোট ওজন এর মাত্রাগুলোকে অনেকটা ইচ্ছামত চলাচল করা যায়। রবীন্দ্রনাথ এই কথা বলে এর শোষণ শক্তির কথা উল্লেখ করে উদাহরণ দিয়ে বুদ্ধির দিয়েছেন যে অযুক্তাক্ষরের জায়গায় বসালেও ছন্দ পতন ঘটবে না, কারণ পয়ারে যে ফাঁক থাকে সেই ফাঁকের মধ্যে যুক্তাক্ষরকে শোষণ করে নেবার ক্ষমতা পয়ারের রয়েছে—

৮

৬

পাষণ মিলিয়ে যায় / গায়ের বাতাসে

এই চরণে যুক্তাক্ষর নেই, যুক্তাক্ষরের ওজন ক্রমে ক্রমে বাড়িয়ে দিয়েও পয়ারে কোলিন্যকে বজায় রাখা যেতে পারে—

৮

৬

পাষণ মর্দাছ'য়া যায় / গায়ের বাতাসে

যুক্তাক্ষর আরও বাড়ানো হ'ল—

পাষণ মর্দাছ'য়া যায় / অঙ্গের বাতাসে

আরও ওজন বাড়ানো হ'ল—

৮

৬

পাষণ মর্দাছ'য়া যায় / অঙ্গের উচ্ছ্বাসে

আরও ওজন চাপান হ'ল—

5

পা
রো
য়

८३

5

माय

১০

4

মানে

100

পৰ্বের
স্বক

মধ্যযুগে দেখতে পাই পন্নারে ব্যবহার প্রধানতঃ হয়েছে আখ্যান, রামায়ণ-মহাভারত মঙ্গল কাব্যে বাংলা বৈষ্ণব পদাবলী প্রভৃতিতে এবং তিন মাস্তামূলক ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে গীতি-কবিতায়।

লঘু ত্রিপদী : এই ছন্দে প্রতি চরণে তিনটি পর্ব থাকে। প্রথম দুই পর্বের পদান্তে অন্ত্যানুপ্রাস থাকে এবং সেই অনুপ্রাস ব মিল দেখানোর জন্য পর্ব দুটোকে আলাদা ভাবে বসিয়ে দেখানো হয়।

৮
ঘটিতে সৌরভময়”

এক আধ তিলে মোরে না দোঁখিলে
যুগ-শত হেন বাসে ৬+৬+৮

দ্বীঘ' ত্রিপদী : লঘু ত্রিপদীর মতই তবে এতে মাত্রা সংখ্যা বেশি—

৮ ৮
তুমি আজ কোথা গিয়া আমি আছি শূন্য হিয়া
কোথায় বা সে তাকিয়া শোকতাপহরা

এসো থাকি দহইজনে সন্মুখে দৃষ্টিতে গৃহ কোণে
দেবতার তরে থাক পূজ্য-অর্ঘ্যভার ।

লঘু চৌপদী : এই ছন্দের প্রতি চরণে চারটি করে পদ থাকে, প্রথম তিনটি পদের শেষে মিল থাকে। প্রতি দুই চরণের শেষেও মিল থাকে। দুই চরণে একটি শব্দ গঠিত হয়। এর সাধারণ মাত্রা সংখ্যা ৬+৬+৬+৫—

৬	৬
চির সুখীজন	ভ্রমে কি কখন
৬	৫
ব্যর্থিত বেদনা	বুঝিতে পারে।
কি যাতনা বিধে	বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীর্ষিবে	দংশনি যারে।

দীর্ঘ চৌপদী : লঘু চৌপদীর মতোই তবে মাত্রা সংখ্যা—
৮+৮+৮+৬; ৮+৮+৮+৭; ৮+৮+৮+১০ হতে পারে—

ক্রমে ক্রমে আঁখিজল

ভিজায় কপোলতল

দুই ফোঁটা অশ্রুজল

শুকাই বাতাসে।

৮+৮+৮+৬

অমিত্রাক্ষর ছন্দ : মাইকেল মধুসূদন ইন্সরাজ কবি মিলটনের আদর্শে অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রথম কাব্য রচনা করেন। এই ছন্দ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—

"If well recited, it sounds as much like prose as English Blank verse sounds like English Prose, retaining at the same time a sweet musical impression".

অমিত্রাক্ষরের বৈশিষ্ট্য : (ক) এই ছন্দে অর্থ বিভাগ ও ছন্দোবিভাগ পরস্পর মিলে যায় না অর্থাৎ 'যতি' ছন্দের অনুগামী নয়।

(খ) সাধারণ কবিতায় দেখা যায়—যেখানে ছন্দ, সেখানেই যতি পড়ে। অবশ্য মাঝে মাঝে উপচ্ছেদ ও অর্থযতি ঠিক মেলে না।

(গ) অপর ছন্দে রচিত কবিতায় দেখা যায়—ছন্দের আদর্শ অনুসারে—পরিমিত মাত্রার পর যতি পড়ে।

(ঘ) এই ছন্দে কয় মাত্রার পর যতি পড়বে তার বাঁধাধরা কোন নিয়ম নেই।

(ঙ) এই ছন্দ বেগমান এবং আবেগময়। আবেগের প্রয়োজনানুসারে যতি পড়ে, কখনো দ্রুত বা কখনো বিলম্ব পড়ে। তাই এই ছন্দকে 'অমিত্রাক্ষর' এবং অন্য ছন্দকে 'মিত্রাক্ষর' বলা যেতে পারে।

- (চ) যতির অবস্থানের দিক থেকে বিচার করলে দেখতে পাওয়া যায় যে এই ছন্দ পয়ারের অনুরূপ। অর্থাৎ ‘চোন্দ মাত্রার’ প্রতি চরণের শেষে পদ্যযতি এবং চরণের প্রথম ‘আট মাত্রার’ পর অর্ধযতি পড়ে।
- (ছ) পর্বের মধ্যে কোনো পর্বঙ্গের পর ছন্দ দেখতে পাওয়া যায়।
- (জ) একটি চরণের মধ্যে অর্থ বিভাগ সম্পূর্ণ হয় না, অপর চরণের সঙ্গে মিলে অর্থ বিভাগ হয়।
- (ঝ) পদ্যছন্দ এবং উপছন্দ বসানোর বৈচিত্র্যের ফলে এই ছন্দ অর্থ বিভাগের দিক দিয়ে বিচিত্রভাবে বিভক্ত হয়ে থাকে।

মধুসূদন “তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য” সর্ব প্রথম এই ছন্দ প্রয়োগ করেন। কিন্তু সেখানে ছন্দ পতন ঘটেছে বহুবার উপরন্তু ভাষার মধ্যেও জড়তা ছিল। কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্যে এই ছন্দ নিরংকুশ বলা চলে না মাঝে মাঝে ছন্দ পতন ঘটেছে কিন্তু বীরাঙ্গনা কাব্যে এই ছন্দ একেবারে গুটিহীন। মেঘনাদবধ কাব্য থেকে একটি উদাহরণ দেওয়া হল—

৮ ৬

একাকিনী শোকাকুলা / অশোক কাননে ॥
কাঁদে রাঘব বাগ্ধা / আঁধার কুটীরে ॥
নীরবে * * দরন্ত চেড়ী / সীতারে ছাড়িয়া ॥
ফেরে দরে * মত্ত সবে / উৎসব কোতুকে । * *
(* উপচ্ছেদ ; * * পূর্ণচ্ছেদ , /= অর্থযতি ; ॥ = পূর্ণযতি)

কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও কবি নবীনচন্দ্র সেন অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য রচনা করেছেন ; কিন্তু তাঁদের ছন্দে মধুসূদনের ছন্দের গাম্ভীৰ্য ও ধ্বনি প্রবাহ রক্ষিত হয়নি । বহুলাংশে তরল হয়ে পড়েছে—

চাহিয়া সহাস্য চিত্তে / পদ্মের বদনে ॥
কহিলা দণ্ডজেশ্বর / বৃহাস্পতির হাসি, ॥

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

নবীনচন্দ্র পর্বে'র মধ্যে পদুর্ণচ্ছেদ না বসিয়ে অর্থযাতিতে পদুর্ণচ্ছেদ দিয়ে বৈচিত্র্য আনতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু মধুসূদনের সেই গাম্ভীৰ্য ও ধ্বনি প্রবাহের অভাব দেখতে পাই—

দূর হোক ইতিহাস ! × × দেখ একবার ॥

মানব হৃদয় রাজ্য / x x দেখ নিরন্তর ॥

বহিতেছে কি ঝটিকা / x x

মধুসূদন রচনা করেছিলেন—“অমিল অমিগ্রাফর” ছন্দে ; রবীন্দ্রনাথ সেই অমিল-অমিগ্রাফর ছন্দকে “সমিল-অমিগ্রাফর” করেছেন উপরন্তু পর্বের মাহা-পাণ্ডিতিতে মধুসূদনকে অনুসরণ না করে নোতুনস্বের পরিচয় দিয়েছেন—

৮ ৬
গ্রামে গ্রামে সেই বাতর্না / রটি গেল ক্রমে x ॥

৮ ৬
মৈত্র মহাশয় যাবে / সাগর সঙ্গমে ॥

৬ ৮

তীর্থস্থান লাগি । × × / সঙ্গদল গেল জুড়ি ॥

১০ ৪
কত বালবৃদ্ধ-নরনারী × × / নৌকা দুটি ॥
প্রস্তুত হইল ঘাটে । × ×

রবীন্দ্রনাথ “সমুদ্রের প্রতি” কবিতায়—৮+৬ ; ৬+৮ না করে—৮+১০ ;
১০+৮ করেছেন—

৮ ১০
হে আদি জননী সিন্ধু / * বসুন্ধরা সন্তান তোমার ॥ *

১০ ৮
একমাত্র কন্যা তব কোলে / * * তাই * তন্দ্রা নাহি আর ॥

১০
চক্ষু তব * তাই বক্ষ জুড়ি / * সদা শঙ্ক, সদা আশা ॥

৬
সদা আন্দোলন ; * *

“স্বৰ্গ হতে বিদায়” কবিতায় আর এক পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন—পর্বের মাগ্নাতে—

স্বর্গ^৬ তব / রহস্যক অমৃত ॥ ৪ / ৬

মতে' থাক স্নেহে দ্বঃথে / অনন্ত মিশ্রিত ॥ ৮+৬

প্রেমধারা অশ্রুজলে / চিরশ্যাম করি ॥ ৮+৬

ভূতলের স্বর্গখণ্ড / গদ্যলি / হে অঙ্গরি ॥ ৮/২/৪

প্রমথ চৌধুরী সনেট রচনার অনেক সময় $৮/২/৪=১৪$ পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ বলাকায় যে অসম ছন্দ ব্যবহার করেছেন—তার মধ্যেও অমিত্রাক্ষর
রীতির স্পর্শ রয়েছে এবং এতে মিত্রাক্ষর রীতিরও স্পর্শ রয়েছে। সেজন্য একে সমিল-

অমিল ছন্দ বলাই বাঞ্ছনীয়। মিগ্রাক্ষরের অবস্থান বোঝাবার জন্য কবি যেন পয়ারের পর্বগদ্যলোকে ভেঙে সাজিয়ে দিয়েছেন। ফলে এই হয়েছে যে—পঙ্ক্তিভিতে অন্ত্যানুপ্রাস থাকলেও প্রতি পঙ্ক্তিভিতে সমমাত্রার অক্ষর সংখ্যা নেই। বলাকার পঙ্ক্তিগদ্যলো প্রায়ই অসম্পদ্বর্ণ—এই অসম্পদ্বর্ণ তাই হচ্ছে এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। ছেদ ও যতির দিক থেকে এই ছন্দ সম্পদ্বর্ণ বন্ধনমুক্ত। পদ্বর্ণছেদ বা অর্ধছেদ কত মাত্রার পর থাকবে তার কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই।

বলাকার ছন্দাতিরিক্ত শব্দ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত রয়েছে। অতিরিক্ত শব্দগদ্যলো প্রধান অক্ষরগদ্যলোর সঙ্গে এমনিভাবে জড়িয়ে রয়েছে যে তাদের হঠাৎ চেনার উপায় নেই।

বলাকা গতির কাব্য। এর ছন্দেও একটা গতি রয়েছে— যে গতি ভাবের গতি। ভাবের সঙ্গে কথাগদ্যলো জড়িয়ে পড়ে একটা অভিনব দান করেছে—

হে ভুবন

আমি যতক্ষণ

তোমারে না বেসেছি নু ভালো

ততক্ষণ তব আলো

খুঁজে খুঁজে পায় নাই তার সব ধন।

যতি ও ছেদ বিচার করে অমূল্যধন এর ছন্দোলিপি করেছেন—

“হে ভুবন * আমি যতক্ষণ / * তোমারে না ॥

বেসেছি নু ভালো / * * ততক্ষণ * তব আলো ॥ *

খুঁজে খুঁজে পায় নাই / * তার সব ধন ॥ * *

বলাকার আরও এক ধরনের ছন্দ রয়েছে। এই কবিতার ছন্দোলিপি করার সময় দেখতে পাওয়া যায়—পর্বের আগে কখনো কখনো ছন্দের অতিরিক্ত শব্দ রয়েছে। এই অতিরিক্ত শব্দকে ছন্দোলিপির হিসাব থেকে বাদ দিতে হবে—

হীরা মুক্তা মাণিক্যের গটা * ০ + ১০

যেন শূন্য দিগন্তের / ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা * ৮ + ১০

যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক * * ০ + ১০

(শূন্য থাক) এক বিন্দু নয়নের জল ০ + ১০

কালের কপোল-তলে / শূন্য সমুজ্জ্বল * ৮ + ৬

এ তাজমহল × × ০ + ৬

“শূন্য থাক” অতিরিক্ত শব্দ গৃহ্য বলে ছন্দোলিপি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এই

কবিতাতে কখনো একটি পর্ব আবার কখনো দুটি পর্ব রয়েছে। যেখানে দুটো পর্ব নেই সেখানে “o” চিহ্ন দিয়ে বোঝান হয়েছে।

গৈরিশ চন্দ : নাট্যকার গিরিশচন্দ তাঁর নাটকের পদ্যাংশে যে ছন্দ ব্যবহার করেছেন—তাও অমিত্রাক্ষর ছন্দের ওপর ভিত্তি করে সৃষ্ট। তবে এই ছন্দের আদিরূপ পাই নাট্যকার ব্রজমোহন রায়ের “দানব বিজয়” নাটকে এবং রাজকৃষ্ণ রায়ের “নিভৃত নিবাস” কাব্যে। তবে গিরিশ চন্দ্রের হাতে এই ছন্দ একটা সুদৃষ্ট রূপ লাভ করে। গিরিশচন্দ্র প্রবর্তিত ছন্দকে অমূল্যধন বলেছেন—Free Verse বা মূল্ডক ছন্দ। মূলতঃ এ ছন্দ হচ্ছে “ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দ”।

রাজকৃষ্ণ রায় “পদ্য পঙ্ক্তি গদ্য” অর্থাৎ ‘গদ্যকবিতা’ও লিখেছেন—
“সাধের ফুল ! ভিজে গেছি স্ ?

তোর নধর অধরে ও টল্টল কোছে ?—

সুধা ? — মধু ?

না, ও যে মেঘের জলবিন্দু ।” (বর্ষা গোলাপ)

গিরিশ প্রবর্তিত ছন্দের পর্ব সংখ্যা সমান নয় এবং তার দৈর্ঘ্যও সমান নয়। ভাব-গাম্ভীর্য বজায় রাখার জন্য গিরিশচন্দ্র অনুরূপ ভাবে পর্ব রচনা করেছেন—

অভাগিনী তুমি ।	o + ৬
পতি ভাগ্যে * / ভাগ্যবতি নারী * *	৪ + ৬
খুঁজে দেখ * / এ তিন ভুবন * *	৬ / ৪
কেবা আছে * / ভাগ্যবান মম সম ।	৪ / ৬

চতুর্দশপদী কবিতা : ইংরাজী Sonnet কে মধুসূদনই সর্ব প্রথম ‘চতুর্দশপদী কবিতা’ নাম দিয়ে ইতালীয় ছন্দকে বাংলার মাটিতে প্রতি-রোপণ করেন। Sonnet বস্তুটি বিলাতী, কিন্তু চোন্দ-পদের কবিতার জন্ম হয়েছিল বাংলাদেশেই। তবে মধুসূদন ঐ “চতুর্দশপদী” কবিতাকে বিলাতী অলঙ্কারে সাজিয়ে একটা নোতুন রূপ দিয়েছেন। ‘সনেট’ রচনাতেও মধুসূদন পয়ারের পর্ব ও মাত্রা ভাগ (৮+৬) কেই মেনে নিয়েছেন এবং পয়ারের পদান্তের অনুপ্রাসকে অন্যভাবে সাজিয়েছেন—

একথা ঠিক, মধুসূদন যখন ভাসাই নগরীতে বাস করছিলেন তখনই ইতালীয় ভাষায় রচিত সনেট পড়ে সনেট রচনার প্রেরণা অনুভব করেন। এবং

মনমোহন ঘোষকে বলেন—“In my humble opinion, if cultivated by men of genius, our Sonnet in time would rival the Italian.”

অনেক সমালোচক বলেন যে একাদশ শতাব্দীতে পতু'গীজ কবি “গিড্যো আরেৎসওই (Giudo D' Arezzo) প্রথম সনেট রচনা করেন। মহাকবি দান্তেও সনেট রচনা করেছেন কিন্তু সনেট রচনায় সার্থকতা লাভ করেছেন—ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইতালীয় কবি পেত্রার্ক। পরবর্তী কালে ওয়াটস, সারে, সেক্সপীয়র, মিলটন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কীট্‌স, রসেট প্রভৃতি পাশ্চাত্য কবিরা সার্থক সনেট রচনা করেছেন।

ইতালীয় সনেট : এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—

- (ক) চোন্দটি পঙ্ক্তি থাকবে এবং এর দুটো ভাগ - ৮ + ৬।
- (খ) প্রথম আট পঙ্ক্তির মিল হচ্ছে—ক, খ, খ, ক অর্থাৎ প্রথম ও চতুর্থ এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঙ্ক্তির শেষে মিল থাকবে।
- (গ) দ্বিতীয় ছয় পঙ্ক্তির মিলের মধ্যে একটু ব্যতিক্রম রয়েছে—দুটো বা তিনটে মিল থাকতে পারে—গঘ গঘ গঘ অথবা গঘঙ, গঘঙ অথবা গঘঘ, গঘঘ।
- (ঘ) শেষ দুটো পঙ্ক্তিতে কখনই এক মিল থাকবে না।

সনেটের প্রথম আট চরণকে অষ্টপদী বা অষ্টক (Octave) এবং শেষের ছয়টি চরণকে ষট্পদী বা ষড়ক (Sestet) বলা হয়। প্রথম আট পঙ্ক্তির মধ্যে দুটো ভাগ থাকে ৪+৪, প্রতিটি ভাগকে বলা হয়—Quatrain এবং শেষ ছয় পঙ্ক্তির মধ্যে দুটো ভাগ থাকে ৩+৩। এর প্রত্যেকটি ভাগকে বলা হয় tercet।

সেক্সপীয়রীয় সনেট : সেক্সপীয়র পেত্রার্কার রীতি অবলম্বন করেননি। তাঁর গঠন প্রণালী পৃথক। তিনি ‘অষ্টক’ ও ‘ষড়ক’ ভাগ রক্ষা করেননি—তাঁর মিল হচ্ছে—কখ, কখ, গঘ, গঘ, চছ, চছ, ঞঞ।

মিলটন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কীট্‌স প্রভৃতি কবিরা বহুলাংশে পেত্রার্কাকে অনুসরণ করেছেন।

মধুসূদন পেত্রার্কী ও সেক্সপীয়র উভয়কেই অনুসরণ করেছেন—

“কমলে কামিনী আমি / হেরিন্দু স্বপনে	(৮+৬) ক
কালিদহে। বসি বামা / শতদল-দলে—	খ
(নিশীথে চন্দ্রমা যথা / সরসীর জলে	খ
মনোহর।) বাস করে / সাপটি হেলনে	ক
গজেশে, গ্রাসিছে তারে উগরি সঘনে	ক
গুঞ্জরিছে অলিপুঞ্জ অন্ধ পারিমলে	খ
বহিছে দহের বারি মৃদু কলকলে।	খ
কার না ভোলেরে মনঃ, এহেন ছিলনে”	ক

(পেত্রার্কী রীতিতে রচিত।)

“চন্দ্রচূড়-জটজালে আছিল। যেমতি	ক
জাহ্নবী ; ভারত-রস ঋষি বৈপায়ন,	খ
ঢালি সংস্কৃত-হৃদে রাখিলা যেমতি	ক
তুষায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন	খ

(সেক্সপীরীয় রীতি)

মধুসূদন পরারের চরণ নিয়ে সনেট রচনা করলেও ছন্দের প্রবাহে অনেক সময়েই
অমিগ্রাক্ষরের ভাব-রূপ দেখা দেয়—বিশেষতঃ যতি ছন্দের ব্যবহারে।

মধুসূদনের পর দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয় কুমার বড়াল, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ
চৌধুরী, মোহিতলাল মজুমদার প্রমুখ কবিরা বিভিন্ন পদ্ধতিতে সনেট রচনা করেছেন।
রবীন্দ্রনাথ ৮+৬ পরিহার করে অনেক সময় ৮+১০ করেও সনেট রচনা করেছেন—

৮ ৬

“নিশিদিন কাঁদি সখি / মিলনের তরে— ক

যে মিলন ক্ষুধাতুর / মৃত্যুর মতন। ৮+৬

লও লও বেঁধে লও / কেড়ে লও মোরে— ক

লও লজ্জা লও বস্ত্র / লও আবরণ খ

আবার— ৮+১০

কোথা রাতি, কোথা দিন / কোথা ফুটে চন্দ্র সূর্য তারা ক

কেবা আসে কেবা যায় / কোথা বসে জীবনের মেলা খ

কেবা হাসে কেবা গায়, / কোথা খেলে হৃদয়ের খেলা খ

কোথা পথ, কোথা গৃহ / কোথা পান্থ, কোথা পথ হারা খ

(চিরদিন / কড়ি ও কোমল)

একে অক্ষরবৃত্ত মহাপয়ারও বলা হয়।

অক্ষরবৃত্ত পয়ার : ৮+৬=১৪

জন্মেছি যে মর্ত্য কোলে / তাকে ঘৃণা করে

ছুটিব না স্বর্গ আর / মৃত্তি খুঁজিবারে।

অক্ষরবৃত্ত একপদী :

ভিক্ষা অনে বাঁচাব বসুধা

মিটাইব দুর্ভিক্ষের ক্ষধা।

স্বরবৃত্ত

স্বরবৃত্ত বা দলবৃত্ত (Syllabic Style) ছন্দকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন “প্রাকৃত বাংলার ছন্দ”, এবং অমূল্যধন বলেছেন “শ্বাসঘাত” প্রধান ছন্দ। এই ছন্দ “ছড়ার ছন্দ” নামে সমধিক প্রচলিত।

ছড়া, পাঁচালি, লোকগীতির মধ্যেই এই ছন্দ মূলতঃ আবদ্ধ ছিল—

“চান করে যেবা নারী খায় গুয়া পান
লক্ষ্মী বলে সেই নারী আমার সমান ॥

সকাল বেলা ছড়া দেয় সন্ধ্যা হলে বাতি
লক্ষ্মী বলে সেই ঘরে আমার বসতি ॥

শিরে ছিল আর বাঁশিটী তুল্যা নিল হাতে
ঠার দিয়া বাজাইল বাঁশী মহুরারে আনিতে।

যেনা নাচন, যেনা
বট পুকুরের কেনা।

এই ছড়া ও গীতিকাগুলো রচিত হয়েছে অ-সাধু ভাষায়। অ-সাধু ভাষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—“বাংলার সাধু ভাষাটা খুব জড়ালো ভাষা, এবং তাহার চেহারা বলিয়া একটা পদার্থ আছে। আমাদের সাধু ভাষার কাব্যে এই অ-সাধু ভাষাকে একেবারেই আমল দেওয়া হয় নাই, কিন্তু তাই বলিয়া অ-সাধু ভাষা যে বাসার গিয়া মরিয়া আছে তাহা নহে। যে আউলের মূখে বাউলের মূখে, ভক্ত কবিদের গানে, মেয়েদের ছড়ায় বাংলা দেশের চিত্তটাকে একেবারে শ্যামল করিয়া ছাইয়া রহিয়াছে। কেবল ছাপার কালির তিলক পরিয়া যে ভদ্র সাহিত্য সভায় মোড়ল করিয়া বেড়াইতে পারে না। কিন্তু তাহার কণ্ঠে গান থাকে নাই, তাহার বাঁশের বাঁশি বাজিতেছে। সেই সব মেঠো গানের ঝরণা তলায় বাংলা ভাষার হসন্ত শব্দগুলো নুড়ির মতো পরস্পরের উপর পড়িয়া ঠুনঠুন শব্দ করিতেছে। আমাদের ভদ্র সাহিত্য পল্লীর গাভীর দিঘিটার স্থির জলে সেই শব্দ নাই; সেখানে হসন্ত ঝংকার বন্ধ।”

ছড়ার ছন্দে কবিতা আগে রচিত হয়েছে (পূর্ব অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে); কিন্তু একে সাহিত্যের আমদারবারে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত করেন রবীন্দ্রনাথ। এই ছন্দে বহু কবিতা কাব্য তিনি রচনা করেছেন। এই চলিত ভাষার স্রোতে যে কলধারা

রয়েছে তা কবি চিত্তকে আকর্ষণ করেছে। চলতি ভাষার হসন্ত স্নুরে তিনি বলেছেন—

আমার সকল কাঁটা ধন্য করে
ফুটেবে গো ফুল ফুটেবে।
আমার সকল ব্যথা রঙিন হয়ে
গোলাপ হয়ে উঠবে।

চলতি ভাষার রচিত এই পঙ্ক্তিগুলোকে যদি “সাধু ভাষার ছন্দ” এ লেখা যায়, তাহলে তার যে চেহারা দেখা দেবে তা কবি নিজে লিখে দেখিয়েছেন—

“যত কাঁটা মম সফল করিয়া ফুটিবে কুসুম ফুটিবে।
সকল বেদনা অরুণ বরণে গোলাপ হইয়া উঠবে।”

আবার যুক্তবর্ণকে যদি একমাত্রা করে ধরে একে লেখা যায় তাহলে এর চেহারা হবে—

“সকল কণ্টক সার্থক করিয়া কুসুম শবক ফুটিবে,
বেদনা যন্ত্রণা রক্তমূর্তি ধরি গোলাপ হইয়া ফুটিবে।”

চলতি ভাষার এই ছন্দ সম্পর্কে তিনি আরও বলেছেন—“সংস্কৃত ভাষার জরিজহরতের কালর-ওরালা দেড়হাত দুইহাত ঘোমটার আড়ালে আমাদের ভাষা বধূটির চোখের জল মুখের হাসি সমস্ত ঢাকা পড়িয়া গেছে, তাহার কালো চোখের কটাক্ষে যে কত তীক্ষ্ণতা তাহা আমরা ভুলিয়া গেছি। আমি তাহার সেই সংস্কৃত ঘোমটা খুলিয়া দিবার কিছু সাধনা করিয়াছি তাহাতে সাধু-লোকেরা ছি ছি করিয়াছে। সাধু লোকেরা জরিব আঁচলটা দেখিয়া তাহার দর যাচাই করুক; আমার কাছে চোখের চাহনিটুকুর দর তাহার চেয়ে অনেক বেশি, সে যে বিনামূল্যের ধন, সে ভট্টাচার্য পাড়ার হাটে বাজারে মেলে না।”

এই ছন্দের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—

- (ক) প্রতিটি পর্বের গোড়ায় একটি করে শ্বাসাঘাত বা Stress পড়বে।
- (খ) এই শ্বাসাঘাতের ফলে পর্বের অক্ষরে ব্যঞ্জনান্ত শব্দ সংকুচিত হবে একমাত্রার হবে।
- (গ) এর প্রতি পর্বে ৪ মাত্রা এবং ২ মাত্রা করে পর্বঙ্গ থাকে। সাধারণতঃ প্রতিটি চরণে ৪টি পর্ব থাকবে এবং শেষ পর্বটি অপূর্ণ থাকবে। তবে রবীন্দ্রনাথ এই মতবাদকে সম্পূর্ণ মেনে নেননি। তিনি এই ছন্দে ২, ৩, ৪, ৫ পর্বের চরণেরও কবিতা রচনা করে বৈচিত্র্য এনেছেন।
- (ঘ) এই ছন্দে প্রায় প্রত্যেক পর্বেই যুগ্মধ্বনি ব্যবহার হয়; অবশ্য ব্যতিক্রমও দেখা যায়।
- (ঙ) এই ছন্দে পরের মত ধ্বনি প্রবাহ দেখতে পাওয়া যায় না।

- (চ) শ্বাসাঘাত থাকায় এর লয় হয়েছে—দ্রুত ।
- (ছ) বাংলা ভাষার উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য এই ছন্দে বিশেষ ভাবে বিধৃত হয়ে নৃত্যচপল করে তুলেছে ।
- (জ) এই ছন্দ স্বরধ্বনির পরিমিত সংখ্যার ওপর অনেকটা নির্ভরশীল ।
- (ঝ) এই ছন্দ নদী-মাতৃক বাংলা দেশের ঘরোয়া ছন্দ !
- (ঞ) প্রাচীন কালে একে “ধামালী”ও বলা হয়েছে । তখন পর্বের মাত্রা ৪ অক্ষরে সীমাবদ্ধ ছিল না, উচ্চারণের সময়ে প্রয়োজন মত ধ্বনি বাড়িয়ে বা কটিয়ে নেওয়া হত—বাঙালি মেয়েদের খোঁপার মতো ।
- (ট) সংবৃত ও বিবৃত (Open and Closed Syllable) প্রতিটি ১ মাত্রা ওজনের !
- (ঠ) স্বরবৃত্ত-রীতিতে দীর্ঘ ও লঘু দ্বিপদী, পয়ার রচিত হয়েছে এবং রবীন্দ্রনাথ স্বরবৃত্তেও ‘মুক্তক’ পদ রচনা করেছেন ।
- (ড) শ্বাসাঘাত থাকায় যৌগিক অক্ষর হুস্ব বলে পরিগণিত হয়েছে
পয়ার (লঘু)
খাঁচার ভিতর / অচিন্ পাখী // কেমনে আসে / যায়
ধরতে পারলে / মনবেড়ী / দিতাম্ তাহার / পায় ।

$$8+8+8+2$$

8 8 8 8
রেবার্ তটে / চাঁপার তলে / সভা বসত / সন্ধ্যা হলে=১৬

8 8 8 ২
আজ্ বিকালে / কোকিল ডাকে / শূনে মনে / লাগে=১৪

এটাকে আবার—

৮ ৬
আজ্ বিকালে কোকিল ডাকে / শূনে মনে লাগে
বাংলা দেশে ছিলাম যেন / তিন্ শো বছর আগে”

করা যেতে পারে । (স্বরবৃত্ত দ্বিপদী)

স্বরবৃত্ত একপদী (১০ মাত্রার)

কাঁকন-জোড়া / এনে দিলেম্ / যবে । ৮+৮+২=১০
ভেবেছিলাম্ / হয়তো খুশি / হবে ।

স্বরস্বত চৌপদী :

দুয়ার জুড়ে কাঙাল বেশে = ৮
 ছায়ার মতো চরণ-দেশে = ৮
 কঠিন্ তব নুপূর ঘেসে = ৮
 আর বসে না / রইব = $8+2=10$

স্বরস্বত মহাপয়ার :

৪ ৪ ৪ ৪ ২
 যারা আমার্ / সাঁঝ-সকালের্ / গানের দীপে / জ্বালিয়ে দিলে / আলো
 আপন্ হিয়ার / পরশ্ দিয়ে / এই জীবনের্ / সকল্ সাদা / কালো
 (পূরবী / রবীন্দ্রনাথ) = ১৮ মাত্রা।

অসম পর্ব :

আমি যদি / জন্ম নিতেম্ / কালিদাসের্ / কালে। $8+8+8+2$
 এক্টি শ্লোকে / স্তুতি গেয়ে = $8+8$
 রাজার্ কাছে / নিতাম্ চেয়ে = $8+8$
 উজ্জয়িনীর বিজন্ প্রান্তে / কানন্-ঘেরা বাড়ি = $8+8+8+2$

স্বরস্বত মুক্তক :

মা কেঁদে কয় / মঞ্জলী মোর্ / ঐ তো কাঁচ / মেয়ে
 ওঁর সঙ্গে / বিয়ে দেবে / বয়সে ওর্ / চেয়ে
 পাচ্‌গুণো যে / বড়
 তাকে দেখে / বাছা আমার্ / ভয়েই জড় / সড়।
 পলাতকা / রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ ৪ মাত্রার পর্বকে ভেঙে ৩ মাত্রার করে করেছেন—

কৃষ্ণ কলি / আমি তারেই বলি = $8/8/2$
 অমূল্যধন / আনন্দ মোহন।

রবীন্দ্রনাথ করেছেন —

কৃষ্ণ-ও / কলি- / আমি / তারেই / বলি- = $৩+৩+৩+৩+৩$
 অথবা

বৃষ্টি পড়ে / টাপদুর্টুপর্ / নদেয় এল / বান্
 শিব্ ঠাকুরের / বিয়ে হল / তিন কন্যে / দান্ = $8+8+8+2$

রবীন্দ্রনাথ একে বলেছেন ৩ মাত্রার ছন্দ (অমূল্যাধনের মতে ৪ মাত্রার)

বৃষ্টি / পড়ে- / টাপড় / টপড় / নদেয় / এল- / বা-ন

শিবঠা / কুরের / বিয়ে- / হবে- / তিনক / ন্নে- / দা-ন ।

তার মত হচ্ছে তিন গণনায় যেখানে যেখানে ফাঁক, পাশ্বেবর্তী স্বরবর্ণগুলো সহজেই ধ্বনি প্রসারিত করে সেই পোড়ো যায়গা দখল করে নিয়েছে ।

মুক্তক :

মা কেঁদে কয় / মঞ্জলী মোর / ঐ তো কাঁচি / মেয়ে

ওরি সঙ্গে / বিয়ে দেবে / বয়সে ওর / চেয়ে

পাঁচগুণো যে / বড়

তাকে দেখে / বাছা আমার / ভয়েই জড় / সড়

পলাতকা / রবীন্দ্রনাথ

মাত্রাবৃত্ত

‘মাত্রাবৃত্ত’ বিলম্বিত লয়ের ছন্দ । অমূল্যাধন এর নাম দিয়েছেন—ধ্বনি প্রধান ছন্দ ; রবীন্দ্রনাথ নাম দিয়েছেন—“সংস্কৃত ভাষা” ছন্দ এবং প্রবোধচন্দ্র এর নাম দিয়েছেন—‘কলাবৃত্ত’ (moric style) ‘মাত্রাবৃত্ত’ নামটি আগে প্রবোধচন্দ্র দিয়েছিলেন ।

এই ছন্দের দুটো রূপ—(১) প্রাচীন রূপ (২) আধুনিক রূপ । প্রাচীন রূপটির সুর হুয়েছে চৰ্যাগাদ থেকে এবং এর শেষ সীমা রবীন্দ্রনাথের ‘মানসী’ গ্রন্থের পূর্ব পর্যন্ত । এই ছন্দের আধুনিক রূপটি রবীন্দ্রনাথের দান ।

আনন্দমোহন বলেছেন, যে রীতিতে মৃদুদল (স্বরাস্ত সিলেবেল) মাত্রই একমাত্রার এবং স্বরাস্ত ও হলন্তরুদ্ধ দল সব সময়ে সম্প্রসারিত ও দুই মাত্রার বলে গণ্য হয় তাকে “নব্যকলাবৃত্ত” রীতি বলা হয় । আর যে ক্ষেত্রে উক্ত লক্ষণ ছাড়াও দীর্ঘস্বর দ্বিমাত্রক মৰ্যাদা পায় তাকে “প্রাচীন বা প্রজ্ঞকলাবৃত্ত” বলে অভিহিত করা হয় । সংস্কৃত ছন্দের অনুসরণে রচিত ভারতচন্দ্রের কবিতায়, রবীন্দ্রনাথের ‘জনগণমন’—গানে এ বিশুদ্ধ বা শিল্পরূপ এবং চৰ্যাগীতি, বিদ্যাপতি, গোবিন্দ দাস প্রভৃতি পদকর্তাদের ব্রজবুলি গীতিগুলোতে এর শিথিল রূপ দেখতে পাই । রবীন্দ্রনাথ প্রজ্ঞকলাবৃত্ত ছন্দকে বৈষ্ণব পদাবলীর মূখ্য ছন্দ বলে, বলেছেন—“বৈষ্ণব পদাবলীতে বাংলা সাহিত্যে ছন্দের প্রথম চেউ ওঠে । কিন্তু দেখা যায় তার লীলাবৈচিত্র্য সংস্কৃত ছন্দের দীর্ঘত্বের মাত্রা অবলম্বন করেই প্রধানতঃ প্রকাশ পেয়েছে ।”

বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষায় দুটো ধারা—ব্রজব্দলি এবং বাংলা। ছন্দের ক্ষেত্রেও মোটামুটি বলা যেতে পারে যে—দুটো ধারাই সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়েছে—(১) মাত্রাবৃত্ত (কলাবৃত্ত) এবং (২) অক্ষরবৃত্ত (মিশ্রকলাবৃত্ত)। এই দুটো ধারা দু'জন দিক্‌পাল—বিদ্যাপতি (মাত্রাবৃত্ত) এবং বড়ু চণ্ডীদাস (অক্ষরবৃত্ত)।

মাত্রাবৃত্তের বৈশিষ্ট্য :

- ১) প্রতিটি অক্ষরধ্বনি, এই ছন্দে, বিশেষ ভাবে প্রাধান্য লাভ করে। পয়ারের অক্ষর-ধ্বনির অতিরিক্ত টান এই ছন্দে নেই।
- ২) বিলম্বিত লয়ে ছন্দ ব'লে যৌগিক অক্ষর ২ মাত্রার (দীর্ঘ) অন্য অক্ষর ১ মাত্রার (হ্রস্ব) তবে ব্যতীক্ৰমও আছে।
- ৩) সময় বিশেষে মৌলিকস্বর ২ মাত্রার হতে পারে।
- ৪) যুক্ত ব্যঞ্জননের আগের স্বরটি ২ মাত্রার।
- ৫) হলন্ত বা ব্যঞ্জনান্ত অক্ষরের স্বর দীর্ঘ।
- ৬) 'ং' ও 'ঃ' এর পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘ।
- ৭) ঐ, ঔ দীর্ঘস্বর। অন্যান্য স্বর সাধারণতঃ ১ মাত্রার।
- ৮) এই ছন্দে সাধারণতঃ দু'ধরনের পর্ব থাকে—'বিশেষ পর্ব' ও 'সাধারণ পর্ব'। বিশেষ পর্ব হচ্ছে—যদুস্তাক্ষর দিয়ে গঠিত ছোট ছোট পর্ব এবং সাধারণ পর্ব হচ্ছে বর্ণদ্বারা গঠিত দীর্ঘ পর্ব।
- ৯) এই ছন্দ একান্তভাবেই গীতি ধর্মী।
- ১০) এই ছন্দের শোষণ শক্তি নেই; যা অক্ষরবৃত্তে রয়েছে।
- ১১) বিলম্বিত লয়ের ছন্দ ব'লে আরাম-প্রিয়তা ও আরাম বিমুখতার চূড়ান্ত অভিব্যক্তি দেখতে পাওয়া যায়। সেই জন্য যৌগিক অক্ষরের পুরো দাম দেওয়া হয়।
- ১২) এই ছন্দে শ্বাসবায়ুর পরিমাণের সুক্ষ্ম হিসাব রাখতে হয়।
- ১৩) দুর্বল ছন্দ ব'লে বেশি মাত্রার পর্ব ব্যবহার করা চলে না।

মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্তের মধ্যে পার্থক্য

- ১) মাত্রাবৃত্ত ধ্বনি প্রধান, অক্ষরবৃত্ত তান প্রধান।
- ২) মাত্রাবৃত্ত বিলম্বিত লয়ের ছন্দ, অক্ষরবৃত্ত ধীর লয়ের ছন্দ।
- ৩) অক্ষরবৃত্তে যদুগম ধ্বনি প্রায়ই হ্রস্ব এবং এক মাত্রার; মাত্রাবৃত্তে যদুগম ধ্বনি সাধারণতঃ দীর্ঘ এবং দুই মাত্রার।

- ৪) মাত্রাবৃত্তে অক্ষরের ধ্বনি “পরিমাণ প্রাধান্য” এবং অক্ষরবৃত্তে ধ্বনির উপর “তানের প্রবাহ” বিস্তার লাভ করে।
- ৫) অক্ষরবৃত্তের (পয়ার) শোষণ শক্তি আছে, মাত্রাবৃত্তে তা নেই।
- ৬) অক্ষরবৃত্তে ধ্বনির গাম্ভীৰ্য রয়েছে, কিন্তু মাত্রাবৃত্তের ধ্বনির গাম্ভীৰ্য নেই, আছে চাঞ্চল্য ও মাধুর্য। “পাষণ মিলায়ে যায় গায়ের বাতাসে” থেকে “দুর্দান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ দঃসাধ্য সিদ্ধান্ত” একই ওজনের। মাত্রাবৃত্ত “মেয়েলি ছন্দ” অক্ষরবৃত্ত “পুরুষালি ছন্দ”।
- ৭) অক্ষরবৃত্তে সাধারণতঃ অসমমাত্রার পূর্ণ পর্ব থাকে না, কিন্তু মাত্রাবৃত্তে—৫, ৭ অসম মাত্রার পূর্ণ পর্ব পাওয়া যায়।
- ৮) অক্ষরবৃত্ত সাধারণতঃ ‘ং’ ও ‘ঃ’ এর মাত্রা গণনা করা হয় না, কিন্তু মাত্রাবৃত্তে করা হয়।
- ৯) ছন্দের প্রয়োজনবোধে অক্ষরের দীর্ঘীকরণ উভয়জাতীয় ছন্দে চলে, তবে মাত্রাবৃত্তে দীর্ঘীকরণ অপেক্ষাকৃত বেশি।

স্বরবৃত্তের সঙ্গে মাত্রাবৃত্তের ও অক্ষরবৃত্তের পার্থক্য

- ১) স্বরবৃত্ত দ্রুত লয়ের, মাত্রাবৃত্ত বিলম্বিত লয়ের এবং অক্ষরবৃত্ত ধীর লয়ের ছন্দ।
- ২) স্বরবৃত্ত শ্বাসাঘাত প্রধান, মাত্রাবৃত্ত ধ্বনি প্রধান এবং অক্ষরবৃত্ত তান প্রধান ছন্দ।
- ৩) স্বরবৃত্তে প্রায় প্রতিটি পর্বে একটা প্রবল শ্বাসাঘাত পড়ে, মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্তে তা নেই।
- ৪) অমূল্যধন এবং প্রবোধচন্দ্রের মতে এই ছন্দে ব্যবহৃত পর্বের মাত্রা সংখ্যা ৪; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তিনমাত্রার পর্বকেও স্বীকৃতি দিয়েছেন। তবে মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্তে এধরণের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, রবীন্দ্রনাথ ২,৩,৪ পর্বের চরণেও এই ছন্দ রচনা করেছেন।
- ৫) শ্বাসাঘাত থাকার ফলে যৌগিক অক্ষর হ্রস্ব হয়ে পড়েছে, তবে প্রয়োজনে দীর্ঘও করা হয়।
- ৬) এই ছন্দের মাত্রাবৃত্তের মতো শোষণ শক্তি নেই, যা অক্ষরবৃত্তে রয়েছে।

সংস্কৃত ছন্দের সঙ্গে বাংলা ছন্দের পার্থক্য ;

- ১) সংস্কৃত-উচ্চারণের বিশেষত্ব হচ্ছে তার ধ্বনির দীর্ঘ-হ্রস্বতা। তাদের ‘মাত্রা’ পূর্ব নির্দিষ্ট কিন্তু বাংলা-উচ্চারণে ঐ বাঁধাধরা নিয়ম নেই।

- ২) সংস্কৃত ছন্দ কেবল মাত্র পদক্ষেপের মাত্রা গণনা করেই নিশ্চিত থাকে না, নির্দিষ্ট নিয়মে দীর্ঘত্বস্ব মাত্রাকে সাজানো তার ছন্দের অঙ্গ।
- ৩) বাংলা ছন্দের মধ্যে সংস্কৃত ছন্দের ধ্বনির অভাব দেখতে পাই। বাংলা গীতমূলক ছন্দ। গীত-সুন্দের সাহায্যে প্রত্যেক কথাটিকে মনের মধ্যে সম্পূর্ণ করা হয়। কথার যে অভাব, সুন্দর সেই অভাবকে পূর্ণ করে দেয়—সংস্কৃতে এর বিপরীত দেখি। সংস্কৃতে গীতি কবিতা নেই বললেই চলে—একমাত্র পূর্ণাঙ্গ গীতি কবিতা হচ্ছে—জয়দেবের গীতগোবিন্দ।
- ৪) সংস্কৃতে “যতিবিচ্ছেদঃ” বাংলার “বিচ্ছেদযতি” বা ছেদ একই প্রকার। কিন্তু বাংলায় আর এক ধরনের ‘যতি’ (উপচ্ছেদ) আছে তা সংস্কৃতে নেই। অর্থাৎ বাংলায় *breath pause* (বিচ্ছেদযতি), *Metrical pause* (বিরামযতি) এ যে পার্থক্য রয়েছে সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রে তা স্বীকৃত হয়নি। সংস্কৃতে “যতিজহেবট বিরাম স্থানম্” এবং “যতিবিচ্ছেদঃ”—দুটোরই সংজ্ঞা রয়েছে। কিন্তু সংস্কৃত ছন্দোবিদদের ধারণা যখন ধ্বনির বিচ্ছেদ ঘটবে, সেই সময়েই জিহ্বা বিরাম লাভ করবে এবং অন্য সময়ে জিহ্বার ক্রিয়া অবিরাম চলতে থাকবে। কিন্তু একটা কথা—যখন দীর্ঘস্বর উচ্চারিত হয়; তখন জিহ্বা সামান্য বিরাম পায় এবং ঐ বিরাম পায় বলেই ২৮ মাত্রার ৩২ মাত্রার পর ছেদ বসান যেতে পারে।
- ৫) বাংলা উচ্চারণ এবং সংস্কৃত উচ্চারণ এক ধরনের নয়।—প্রত্যেক বাংলা শব্দের প্রথমে একটা শ্বাসঘাত পড়ে—দেখবি, ভেতর, কটকি প্রভৃতি। “এইত চাই”— এইত চাই। “আশ্তে ভাই ব্যাটারা ভারি পাজী—আশ্তে ভাই ব্যাটারা ভারি পাজী”। এবং এর ফলেই বাংলা শব্দের শেষের দিকের অক্ষরগুলোতে স্বর অপেক্ষাকৃত দুর্বল হয়ে পড়ে এমনকি তৎসম বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের অন্ত ‘অ’কার প্রায়ই উচ্চারিত হয়না—জল=জ+ল্; কিন্তু ‘ল’ বলতে পেছনে ‘অ’ আছে, কিন্তু জল বলতে গিয়ে জলকে জল্ বলে উচ্চারণ করি।
- ৬) বাংলার এক-একটি ছন্দোবিভাগ আর সংস্কৃতে ‘পাদ’ বা ইংরাজীর *foot* এক নয়। সংস্কৃত “পাদ” অর্থ—একটি শ্লোকের চতুর্থাংশ।
- ৭) সংস্কৃত “পবণ্” এর অনুরূপ বাংলার ‘পব’।

মাত্রাবৃত্তের আধুনিক রূপ

মাত্রাবৃত্তের প্রাচীনরূপ অর্থাৎ প্রজ্ঞামাত্রাবৃত্তের প্রাচীন রূপ এবং ব্রজবুলি ভাষায় রচিত মাত্রাবৃত্ত (প্রজ্ঞা) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আধুনিক রূপের কিছু উদাহরণ উদ্ধৃত করা হ’ল—

মাত্রাবৃত্ত পয়ার (লঘু)

২১ ১ ২১ ১ ২১১ ১১

বর্ষার নিব্বারে / অঙ্কিত কায় = ৮+৬= ৮

দুই তীরে গিরিমালা / কতদূর যায় = ৮+৬=১৪

সূর্য চলেন ধীরে / সন্ন্যাসী বেশে = ১৪

পশ্চিম নদীতীরে / সন্ধ্যার দেশে ।

মাত্রাবৃত্ত ত্রিপদী (১০+৭) মাত্রা

১১১ ১১ ২১১ ১ ১১ ১১১ ২

নূতন-জাগা কুঞ্জবনে / কুহরি উঠে পিক

বসন্তের চুম্বনেতে / বিবশ দশ দিক্ ॥

মাত্রাবৃত্ত ত্রিপদী (লঘু)

৬

৬

ভূতের মতন

চেহারা যেমন

৮

নির্বোধ অতি যোর ।

মাত্রাবৃত্ত ত্রিপদী : (৮+৮+১০)

অশ্রাণ হল সারা স্বচ্ছ নদীর ধারা

বহি চলে কলসংগীতে ।

বেলা যে : পড়ে এলো / জল্কে : চল্ = (৩+৪) ৭

(৩+২) ৫

পূরনো : সেই সুরে কে যেন ডাকে দূরে

কোথা সে : ছায়াসখি / কোথা সে : জল্

কোথা সে : বাঁধাঘাট / অশথ : তল্

ছিলাম আনমনে / একেলা : গৃহকোণে

কে যেন ডাকিল রে / জল্কে : চল্ ।

মদ্রোবৃত্ত দীর্ঘ চৌপদী (৮+৮+৮+৫)

পথপাশে মল্লিকা / দাঁড়াল আসি — ৮+৫

বাতাসে সুগন্ধের / বাঁজাল বাঁশি = ৮+৫

ধরার স্বয়ম্বরে / উদার আড়ম্বরে

আসে বর অম্বরে / ছড়ায় হাসি ।

৬ ৬ ৫
হে মোর চিত্ত / পূণ্যতীর্থে / জাগোরে ধীরে

এই ভারতের / মহামানবের / সাগর তীরে ।

৬ ৬ ৬ ২
নমো নমো নম / সুন্দরী মম / জননী জন্ম / ভূমি

গঙ্গার তীর / সিন্ধু সমীর / জীবন জুড়ালে / তুমি — ২০ মাত্রা

মাত্রাবৃত্ত মুক্তক :

পর্ব— ৫ ৫ ৫ ২
৪ সাগর জলে / সিনান করি / সজল এলো / চলে

৩ ৫ ৫ ২
বসিয়া ছিলে / উপল-উপ / বুলে

২ ৩ ২
শিখি / বাল

৫ ৫ ৫ ২
মাটির পরে / ফুটিল-রেখা / লুটিল চারি / পাশ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ছন্দের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাথ

ছন্দের মাত্রা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অমূল্যধনের মতবৈধ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর “ছন্দ” শীর্ষক বইটিতে এ বিষয়ে সর্বিশেষে আলোচনা করেছেন। তিনি বহু কবিতা রচনা করে তাঁর মতবাদ ব্যক্ত করেছেন—

আঁধার রজনী পোহাল

জগৎ পূরিল পূলকে

বিমল প্রভাত কিরণে

মিলিল দ্যুলোক ভুলোকে।

রবীন্দ্রনাথ একে বলেছেন ৯ মাত্রার ছন্দ এবং অমূল্যধন বলেছেন ৬ মাত্রার ছন্দ। অমূল্যধন এর পর্ব ভাগ ও মাত্রা নিরূপণ করেছেন—

আঁধার রজনী / পোহালো

জগৎ পূরিল / পূলকে। ৬ / ৩

রবীন্দ্রনাথ অমূল্যধনের পর্ব ও পর্বান্ত ভাগ এবং নিরূপিত মাত্রাকে গ্রহণ করে বলেছেন—“এর ষড়্ভা ৬ মাত্রার, ল্যাভটা ৩ মাত্রার, চোখ দিয়ে এক পঙ্ক্তির নয় মাত্রা দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু অমূল্যবাবুর মতে, কান দিয়ে দেখলে ওর দুই অসমান ভাগ বেরিয়ে পড়ে।

তিনি আরও বলেছেন—“এই ছন্দের আবর্তন ছয় মাত্রার পর্যায়ে ঘটে না, কক্ষপথ সম্পূর্ণ হয়েছে নয় মাত্রায়। নয় মাত্রায় তার প্রদক্ষিণ নিজেকে বারংবার বহুগুণিত করেছে। এই নয় মাত্রায় মাঝে মাঝে সমভাগে জোড়ের বিচ্ছেদ আছে। সেই জোড় ছয় মাত্রার না, তিন মাত্রায়।

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মতে —

আঁধার / রজনী / পোহালো

জগৎ / পূরিল / পূলকে। ৩, ৩/৩

রবীন্দ্রনাথ এই মাত্রা গণনা সম্পর্কে বলেছেন—“আমার ছন্দের লক্ষণ এই—
প্রত্যেক পদে তিন কলা, প্রত্যেক কলায় তিনমাত্রা, অতএব সমগ্র পদের সমষ্টি ৯।”

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য হচ্ছে—“ছন্দকে চিনতে হ’লে প্রথম দেখা চাই—তার পদের
মোট মাত্রা, তারপর কলাসংখ্যা, তারপরে প্রত্যেক কলার মাত্রা।”

তিনি উদাহরণ দিয়েছেন—

সকাল বেলা / কাটিয়া গেল

বিকাল নাহি / যায়।

৫+৫+৫+২=১৭

রবীন্দ্রনাথের মতে—এই ছন্দ ১৭ মাত্রার, এর কলা (পর্ব) সংখ্যা ৪। শেষ
কলাটি ২ মাত্রার বাকীগুলো ৫ মাত্রার।

তিনি আরও উদাহরণ দিয়েছেন—

নয়নে / নিঠুর / চাহনি

হৃদয়ে / করুণা / ঢাকা।

গভীর / প্রেমের / কাহিনী

গোপন / করিয়া / রাখা।

পদের মাত্রা সংখ্যা—১৭।

কলা সংখ্যা—৬ ; একটি অপূর্ণ কলা রয়েছে।

মাত্রা সংখ্যার—পূর্ণকলার—৩ ; অপূর্ণ কলার—২

আরও একটি উদাহরণ দেওয়া হ’ল—

বারে বারে / যায় চলি / য়া

ভাসায় গো / আঁখি নীরে / সে

বিরহের ছলে ছলি / য়া

মিলনের / লাগি ফিরে / যে

রবীন্দ্রনাথ এর কলা বিভাগ করেছেন— $8+8+1=9$; এ হচ্ছে ৯ মাত্রার
অক্ষরবৃত্ত ছন্দ। কিন্তু অমূল্যধন এ বিভাগ মানতে রাজী নন। তিনি বলেন যে
এভাবে কলা বিভাগ করলে ছন্দ ক্রটিম হয়ে পড়ে—শুনতে বেথাপ্যা লাগে। এর একটি
কারণ রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন যে অমূল্যধন শব্দকে ভাঙতে রাজী নন (চলিয়া=
চলি/য়া)। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেন যে এভাবে শব্দকে ভাঙলে শব্দের মধ্যে একটি
নোতুন নৃত্যভঙ্গি জেগে ওঠে এবং তার মধ্যে একটা রসানুভূতির সৃষ্টি হয়।

অমূল্যধনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছন্দের পঙ্ক্তি নিয়েও মত-বিবোধ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন আমার বস্তু লেখার পঙ্ক্তি এবং ছন্দের পদ এক নয়। আমাদের হাঁটুর কাছে একটা জোড় আছে বলে আমরা প্রয়োজনমত পা মূড়ে বসতে পারি তৎসত্ত্বেও গণনাও ওটাকে এক পা বলেই স্বীকার করি এবং অনুভব করে থাকি। নইলে চতুঃপদের কোঠায় পড়তে হয়। ছন্দও ঠিক তাই—

সকাল বেলা কাটিয়া গেল

বিকাল নাহি যায়।

অমূল্যবান্ একে দুই চরণ বলেন, আমি বলিনে। এই দুটি ভাগকে নিয়েই ছন্দে সম্পূর্ণতা। যদি এমন হ'ত—

সকাল বেলা কাটিয়া গেল,

বকুলতলে আসন মেলা —

তাহলে নিঃসংশয়ে একে দুই চরণ বলতুম।

উপরি-উক্ত পদ্যাংশকে যদি বিশ্লেষণ করা যায় তা'হলে বলতে হবে যে, যখন—

“সকাল বেলা কাটিয়া গেল

বিকাল নাহি যায়।”

তখন দুটো চরণ মিলেই যে একটি ভাবকে পরিপূর্ণ করেছ ত্রা সহজেই অনুমের হয়—
সুতরাং দেখতে দুটো চরণ হলেও মূলতঃ একটি চরণ।

আর এই পদ্যাংশটিকে দুটো চরণেই বিভক্ত করতে কোনো অসুবিধা নেই—
“বলোছিন্দু / বসিতে / কাছে

দেবে কিছন্দু / ছিল না / আশা

দেব বলে / যেন / যাচে

বুঝিলে না / তাহারো / ভাষা।

(বলোছিন্দু...আশা—১ চরণ, দেব বলে...ভাষা—২ চরণ)

৪ / ৩ / ২ রবীন্দ্রনাথের মতে।

অমূল্যধন এর ছন্দোলিপি করতে গিয়ে পর্ব-ভাগ এ ভাবে করেছেন—

বলোছিন্দু / বসিতে কাছে = ৪ / ৫

(বা—(২+২=৪)+(৩+২)=৫) ৪ / ৫

গদ্য ছন্দ

গদ্য হচ্ছে নিত্য ব্যবহারের ভাষা। কিন্তু রস-প্রকাশের জন্য ঐ নিত্য-ব্যবহারে

ভাষার মধ্যে সুর, তাল, ধ্বনির সৃষ্টি করে ছন্দের হিল্লোল কিছুটা বইয়ে দেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথের মতে শব্দ নারীর নয় পুরুষেরও একটা রূপ রয়েছে। কিন্তু পুরুষের মধ্যে মেয়েলিয়ানা নেই। গদ্য ছন্দের মধ্যে রূপ রয়েছে কিন্তু মেয়েলিয়ানা নেই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—“গদ্যের চালটা পাথে চলার চাল, পদ্যের চাল নাচের।” তাই এদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

গদ্যছন্দ ও পদ্যছন্দের মধ্যে পার্থক্য :-

- ১) পদ্যছন্দের প্রধান লক্ষণ পঙ্ক্তি সীমানায় বিভক্ত তার কাঠামো এবং নির্দিষ্টসংখ্যক ধ্বনিগুচ্ছে এক একটি পঙ্ক্তি সম্পূর্ণ। পঙ্ক্তির শেষে থাকে একটি করে বড় যতি।
- ২) গদ্যের মাত্রা পদ্ধতি স্বাভাবিক।
- ৩) গদ্যেও পর্বঙ্গ রয়েছে। কিন্তু পর্বঙ্গে গোটা শব্দই থাকে, তাকে ভেঙে পর্বঙ্গ ভাগ করা চলে না, পদ্যে তা চলে।
- ৪) পদ্যের পর্বঙ্গের সঙ্গে গদ্যের পার্থক্য হচ্ছে—পদ্যের পর্বের ভেতরের পর্বঙ্গগুলো হয় পরস্পর সমান হবে নইলে তাদের মাত্রার ক্রম অনুসারে তাদেরকে সাজাতে হবে। গদ্যের পর্বঙ্গকে বিভিন্ন আকারে সাজান যেতে পারে।
- ৫) পদ্যছন্দ একা প্রধান এবং গদ্যছন্দ বৈচিত্র্য প্রধান।
- ৬) পদ্যের শব্দক গঠিত হয় গদ্যে তা হয় না।

নিছক গদ্যেও যে-ছন্দ রয়েছে তার একটা উদাহরণ দেওয়া হ'ল—

“রঘুপতি / আসিয়া / কহিলেন / মহারাজ / যুদ্ধের তো /

কোনো উদ্‌যোগ / দেখা যাইতেছে / না।

নক্ষত্র-রায় / কহিলেন / না ঠাকুর / ভয় পাইয়াছে।

বলিয়া অত্যন্ত / হাসিতে / লাগিলেন।”

রবীন্দ্রনাথ তাঁর “লিপিকা” গ্রন্থটি গদ্যে লিখলেও অপূর্ব ছন্দ সৃষ্টি করেছেন—

“এখানে নামলো সন্ধ্যা / সূর্যদেব / কোন দেশে / কোন সমুদ্র পারে / তোমার
প্রভাত হলো ? / অন্ধকারে / এখানে কেঁপে উঠছে / রজনী গন্ধা ॥ বাসর ঘরের দ্বারের
কাছে / অবগুষ্ঠিতা / নববধূর মতো।”

এই হচ্ছে গদ্যে সাজানো খাঁটি গদ্য কবিতা। কথাগুলোকে তির্যক ভঙ্গি দান করাতেই ছন্দের চেউ দেখা দিয়েছে।

মাঝ দরিয়াতে চেউ উঠলে কিনারে এসে লাগে তার তরঙ্গের আঘাত। পরবর্তী-
কালে সেই চেউ দেখা দিয়েছে “তটের বৃকে”।

পদ্য ছন্দের গদ্য কবিতা

“হঠাৎ / সন্ধ্যায়

সিন্ধু বারো / যাঁয় লাগে / তান— ॥

সমস্ত আ / কাশে বাজে”

অনাদি কা / লের— / বিরহ বে / বেদনা— ।

অথবা

ধলেশ্বরী / নদীতীরে / গিসিদের গ্রাম ॥

তার দেও / রের মেয়ে ॥

অভাগার / সাথে তার / বিবাহের / ছিল ঠিক / ঠাক

৪/৪/৪/২, ৪/৪, ৪/৪/৪/৪/২।

অনেকের ধারণা রবীন্দ্রনাথ বিদেশ থেকে এ ছন্দের আমদানি করেছেন। যাঁদের দেশের সঙ্গে পরিচয় নেই, এবং সব সময় বিদেশি রঙিন চশমা পরে থাকেন, তাঁরাই নোতুন কিছু একটা দেখলেই মনে করেন—এ বিদেশি জাহাজে এসে ভারতের ঘাটে ভিড়েছে।

প্রাচীন কালে ভারতীয় সাহিত্যে এই ছন্দ ছিল; তার প্রমাণ—‘যজুর্বেদের গদ্য মন্ত্রের ছন্দকে ছন্দ বলে স্বীকার করা হয়েছে স্নতরাং গদ্য-কবিতাকে খাস্ বিলিতি জিনিষ বললে সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছু বলা চলে না।

বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—“সংস্কৃত কাব্য-অনুবাদ সম্বন্ধে আমার মত এই যে, কাব্যধ্বনির গদ্যে ছাড়া বাংলা পদ্যছন্দের তার গাম্ভীৰ্য ও রস রক্ষা করা সহজ নয়।” কারণ সংস্কৃত ছন্দ বাংলা ভাষায় চালাবার পক্ষে অনেকগুলো অসুবিধে রয়েছে। সে-গুলো হচ্ছে—

- ১) বাংলায় দীর্ঘস্বরের ব্যবহার নেই বললেই চলে।
- ২) বাংলা হলন্ত অক্ষরকে অনেক সময় “দীর্ঘ” বলে ধরা হয়। কিন্তু ধ্বনি গুণের দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় বাংলার হলন্ত দীর্ঘ অক্ষর এবং সংস্কৃত দীর্ঘ অক্ষর এক নয়। বাংলায় শব্দান্তের হলন্ত অক্ষর স্বভাবতঃ দীর্ঘ। বাংলায় পরপর

the complements of the Department of
hi.

যেখানে শব্দের মধ্যে হ্রস্ব অক্ষরকে দীর্ঘ বলে ধরা হয়, সেখানেই ঐ ফাঁকটুকু রেখে দেওয়া হয় এবং টেনে নিয়ে হ্রস্ব অক্ষরকে দ্রুত মাত্রা করা হয়। কিন্তু সংস্কৃত ছন্দে সন্ধি অপরিহার্য বলে ফাঁক রাখবার কোনো উপায় নেই এবং যথার্থ দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণ করেই দীর্ঘ অক্ষর ব্যবহার করতে হয়।

- ৩) বাংলায় চরণকে যে পর্ব বা পর্বাদ্বে বিভক্ত করা হয় তারও একটা রীতি রয়েছে। সংস্কৃতে ঠিক এ-রীতি নেই। দীর্ঘ বা হ্রস্ব অক্ষরের পারস্পর্য জনিত এক প্রকার ধ্বনি হিল্লোলই সংস্কৃত ছন্দের প্রাণ।

বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ছন্দ অবলম্বন করে কিছু কবিতা রচনা অনেকেই করেছেন। একথা পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে কিছু আভাস দিয়েছি এবং কয়েক জনের নামোল্লেখ করেছি। কিন্তু যারা সবিশেষ চেষ্টা করেছিলেন—তাদের মধ্যে ভারতচন্দ্র এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নাম বিগেয উল্লেখযোগ্য।

ভারত চন্দ্র—

২২২ ১ ২২২ ১ ২১ ২১ ২ ১ ২

ভূতনাথ ভূত সাথ দক্ষ যন্ত্র নাশিছে

যক্ষরক্ষ লক্ষ লক্ষ অটু অটু হাসিছে।

তবে ভারতচন্দ্র তৃণকের মূল সূরাটিকে রক্ষা করতে পারেন নি। ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দের ক্ষেত্রেও ভারতচন্দ্র সম্পর্কে ঐ কথা বলতে হয়—“ভুজঙ্গপ্রয়াতে কহে সতি দে সতি দে”।

১২ ২১ ২২ ১ ২১ ২ ২

“মহারদ্র রূপে মহাদেব সাজে।” ভুজঙ্গপ্রয়াত।

তোটক :

১১ ২১১ ২১১ ২১ ২

বিজ ভারত তোটক ছন্দ ভণে

কবি রাজ কহে যত গৌর জনে ॥

এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি বিশেষ প্রাণধান যোগ্য—“নূতন ছন্দ বাংলায় সৃষ্টি করবার শখ যাদের প্রবল, এই পথে তাঁরা অনেক নূতনত্বের সম্ভান পাবেন। তবু বলে রাখি, তাতে সংস্কৃত ছন্দের মোট আয়তনটা পাবেন, তার ধ্বনি তরঙ্গ পাবেন না। মন্দাক্রান্তার মাত্রা গোনো একটা বাংলা ছন্দের নমুনা দেওয়া যাক—

সারা প্রভাতে বাণী

বিকালে গেঁথে আনি

ভাবিনু হারখানি

দিব গলে।

ভয়ে ভয়ে অবশেষে
তোমার কাছে এসে
কথা যে যায় ভেসে
আঁখি জলে ।

শিখরিণীকেও এই ভাবে বাংলায় রূপান্তরিত করা যেতে পারে—

“কেবলি অহরহ মনে-মনে
নীরবে তোমা-সনে
যা-খুশি কহি কত ;
বিরহ ব্যথা মম নিজে নিজে
তোমারি মূর্তি যে
গাড়াইছে অবিরত ।”

“জনগণমন-অধিনায়ক” সংস্কৃত ছন্দে বাংলায় আমদানি একথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন তাঁর “ছন্দ” বইতে ।—

জনগণমন অধি :	না-য়ক জয় হে	৮+৮
	ভা-রত ভা-গ্যবিধা-তা-	১২
(পঞ্চ) জা-ব সিংধু গুজ :	রা-ট মা-রাঠা-	
	দ্রা-বিড় উৎকল বঙ্গ-	২/৮/৮/১২
বিন্ধ হিমা-চল //	যমুনা গঙ্গা-	৮ ৮
	উচ্ছ্বল জলাধি তরঙ্গ-	১২
তব শব্দ না-মে-জা-গে-		১২
তব শব্দ আ-শিষ মা-গে-		১২
গা-হে তব জয়-গা-থা-		১২

সংস্কৃত ছন্দ পদ্ধতিতে রচিত রবীন্দ্রনাথের অপর একটি পদ্যাংশের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা হল—

নী-ল সিংধুজল //	ধৌত চরণ তল	৮+৮
অনিল বিকম্পিত //	শ্যা-মল অঞ্চল	৮+৮
অম্বর চুম্বিত //	ভা-ল হিমা-চল	৮+৮
শব্দ্র তুষা-র কি :	রী-টিনী-	৮/৫

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা ছন্দের যাদুকর ছিলেন । বাংলা কাব্যে তিনি বহু

রকমের ছন্দ দিয়ে কবিতা রচনা করেছেন। সংস্কৃত ছন্দ, ইংরেজি ছন্দ, চীনদেশীয় ছন্দ প্রভৃতিতে বাংলা কবিতা রচনায় বিশেষ বৈশিষ্ট্য এনেছেন। বাংলা ছন্দের ভেতর “স্বরবৃত্ত” এবং অক্ষরবৃত্ত” বিশেষতঃ অক্ষরবৃত্ত ছন্দে নোতুন প্যাটার্ন (ঘটি আকারে, বরফি আকারে) এনেছেন। এমনকি Greek “Bumos” ছন্দে “রাজর্ষি রামমোহন” রচনা করেছেন। জাপানী ছন্দেও তিনি বাংলা কবিতা রচনা করেছেন। সংস্কৃত রুচিরা, মালিনী, তোটক, মন্দাক্রান্তা, পঞ্চচামর প্রভৃতি ছন্দে বাংলা কবিতা রচনা করেছেন।

তোটক :

একি ভাণ্ / ঙারে লুট / কার ধন / লোটানো
একি চাষ / দিয়ে রাশ / করে ফুল / ফোটানো।

রুচিরা :

তখন কেবল / ভরিছে গগন / নতুন মেঘে
কদম কোরক / দুর্লিছে বাদল / বাতাস লেগে ;।
বনাস্তরের / আসিতেছে বাস / মধুর মৃদু
ছড়ায় বাতাস / বরিষা-নারীর / মৃথের সঁধু

পঞ্চচামর :

মহৎ ভয়ের / মুরং সাগর / বরণ তোমার / তমঃ শ্যামল ;
মহেশ্বরের / প্রলয় পিণাক / শোনাও আমায় / শোনাও কেবল।

মালিনী :

উড়ে চলে গেছে বুলবুল / শূন্যায় স্বর্ণ পিঞ্জর।
ফুরায়ে এসেছে ফাগুন / যৌবনের জীর্ণ নিভর।

শাদুল-বিক্রীড়িত ছন্দ :

বিদ্যুৎ ঠেংট
হানে ধুমুচর
ঝড় গড়ুর
পাখ সাট আচোট
বন লোটায়,

গজ'ন গান

মেশে হর্ষ, খেদ—

পাশারি ভেদ ;

বজ্রের বিধান

ফুল ফোটার।

মন্দা ক্রান্তা :

৮ ৭ ৭ ৫
 পিঙ্গল বিহ্বল / ব্যথিত নভতল / কইগো কই মেঘ / উদয় হও ।
 সন্ধ্যার তন্দ্রার / মূরতি ধরি আজ / মন্ত্র মন্ত্র / বচন কও ।

৮ ৭ ৭ ৫
 তুঃ— কশিচৎকান্তা- / বিরহ গদ্য- / স্বাধিকার- / প্রমত্তঃ ।
 ইংরেজী Young Lochvinor ছন্দে রচিত—

সিন্দুর টিপ / সিংহল দ্বীপ / কাণ্ডনময় / দেশ
 স্বরবৃত্ত ছন্দেও এর ছন্দোলিপি করা যেতে পারে—
 সিন্দুর : টিপ / সিংহল : দ্বীপ / কাণ্ডন : ময় / দেশ

বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান

বাংলা ছন্দে প্রথম বৈচিত্র্য আনেন ভারতচন্দ্র। তিনি নূতন সংকেতে চরণ গঠন, নূতন সংখ্যক মাত্রা দিয়ে পর্ব গঠন করার চেষ্টা করেছেন।

ঈশ্বরগুপ্ত ভারতচন্দ্রকে অনুসরণ করেছেন। ছড়ার ছন্দকে তিনি জাতে তুলেছেন। ঈশ্বরগুপ্তের পর এলেন মদনমোহন তর্কালংকার ; তিনিও সংস্কৃত ছন্দকে বাংলাতে চালাতে চেষ্টা করেছেন। প্রাক-রবীন্দ্র যুগে বাংলা-ছন্দের ক্ষেত্রে যুগান্তর এনিছিল—মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তিনিই প্রথম দেখালেন যে বাংলায় ছন্দ যত্নে অনুগামী হওয়ার কোনো আবশ্যক নেই। অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করে বাংলা ছন্দের শৃঙ্খল মোচন করেছেন। বাংলা ছন্দ পেল স্বেচ্ছাবিহারেরও মূর্ত্তির স্বাদ। তারপর এলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘অপূর্ব বস্তু নির্মাণক্ষম প্রতিভা’ নিয়ে। বাংলা ছন্দকে ঐশ্বর্যে করলেন মণ্ডিত। বহু ছান্দসিকের বহু মতকে উড়িয়ে দিলেন। তাঁর স্ব-বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হল নীচে—

- ১) আধুনিক বাংলার ধ্বনি প্রধান (মাত্রাবৃত্ত) ছন্দের প্রচলন রবীন্দ্রনাথ। “মানসী” কাব্যে ‘হলন্ত’ অক্ষরকে দ্বিমাত্রিক ধরে ছন্দো রচনায় এক নোতুন পদ্ধতি প্রবর্তন করলেন তিনি। উত্তর কালে রবীন্দ্রোক্তর যুগের কবিরা সম্ভ্রমে ঐ রীতি

অনুসরণ করে চলেছেন। ছন্দ-সাগরের এ টেউ বাংলার বাহিরেও যে লেগেছে তা অস্বীকার করা চলে না।

বৈষ্ণব পদকর্তাদের রচিত মাত্রাবৃত্তে সংস্কৃত রীতিকে সজ্ঞানে অনুসরণ করার প্রয়াস দেখা দিয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সে পদ্ধতিকে অনুসরণ না করে নিজস্ব পদ্ধতিতে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ কাব্য রচনা করেছেন।

- ২) ‘স্বরবৃত্ত’ বা ছড়ার ছন্দ যা এতদিন শুধু লোকগীতির বাহন ছিল তাকে মূলতঃ তিনিই ভদ্রসভার উপযোগী করে ‘রাজ কণ্ঠে মণিমালা’র মতো করে গড়ে কাব্যলক্ষ্মীর গলায় বরমালা পরিয়ে দিয়েছেন—

“নির্নিরাতে : রাতে / শোনা : গেল / কিসের : যেন / ধ্বনি

ঘুমের : ঘোর / ভেবে : ছিলাম / মেঘের : গর / জনি

‘আগমন’ / থেয়া।

আমি যদি / জন্ম নিতেম্ / কালিদাসের / কালে

দৈবে হতেম / দশম রত্ন / নবরত্নের / মানে। ৪/৪/৪/২

একটি গ্লোকে / স্তুতি গেয়ে ৪+৪

রাজার কাছে / নিতাম চেয়ে ৪+৪

উজ্জয়িনীর / বিজন প্রান্তে / কানন-ঘেরা / বাড়ি ৪+৪+৪+২ (ক্ষণিক)

ডাক্তারে / যা বলে / বলুক নাকো

রাখো রাখো / থুলে রাখো

শিয়রের ওই / জানলা দুটো / গায়ে লাগুক / হাওয়া

মুন্সি / পলাতকা

- ৩) অক্ষরবৃত্ত ছন্দে যুক্তাক্ষর ব্যবহারে অপূর্ব কৃতিত্ব দেখিয়েছেন—

পাষণ মিলায়ে যায় / গায়ের বাতাসে। ৮+৬

দুর্দান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ / দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত। = ৮+৬।

- ৪) শব্দক রচনায় বহু নোতুন ছের সৃষ্টি করেছেন।

- ৫) সনেট ও অমিত্রাক্ষর ছন্দেও নোতুন রীতি প্রবর্তন তিনি করেছেন। “অমিল অমিত্র”কে তিনি “সমিল” করেছেন; এবং ৮+৬=১৪ মাত্রার পরিবর্তে ৮+১০, ১০+৮, ৮+৬, ৬+৮, ১০+৪ প্রভৃতি করেছেন। (নৈবেদ্য ও চৈতালিতে এর বহু উদাহরণ রয়েছে)।

- ৬) 'চরণ' সৃষ্টিতে তিনি "পৃচ্ছগ্রহীতা" না করে— নোতুন ধরণের সৃষ্টি করে বৈচিত্র্য এনেছেন (এই বইতেই উদাহরণ দেওয়া হয়েছে) ।
- ৭) বিলম্বিত লয়ে—৬ মাত্রার পর্ব, পাঁচ ও সাত মাত্রার পর্বও রচনা করেছেন ।
- ৮) 'রেডাভাঙা' পয়ার অর্থাৎ "মুদ্রবন্ধ ছন্দ" এর সৃষ্টিকর্তা তিনি ।
- ৯) গদ্যের পদ নিয়ে পদ্যের গঠনরীতির দ্রষ্টাও তিনি । "লিপিকা"র তিনি এ ছন্দ ব্যবহার করেছেন । 'পদ্যশচ', "শেষ সপ্তক" গ্রন্থে গদ্য-কবিতার প্রবর্তন করেছেন তিনি ।
- ১০) পর্বে 'মাত্রা' গণনাতেও তিনি চিরাচরিত প্রথাকে নির্বিচারে মেনে নেন নি । (এখানে এগুলোর উদাহরণ দেওয়া হ'লনা কারণ আগেই দেওয়া হয়েছে) ।

প্রাকৃত ছন্দ, বৈষ্ণব পদাবলীর ছন্দ ও রবীন্দ্রনাথ—

বৈষ্ণব পদাবলীর ছন্দে মূল ভিত্তি হচ্ছে—প্রাকৃত ছন্দ । বৈষ্ণব পদকর্তারা, এমনকি জয়দেবও সংস্কৃত ছন্দের চেয়ে প্রাকৃতের ছন্দের কাছে বিশেষ ভাবে ঋণী । 'রিক্'থ' হিসাবে বাংলা ছন্দও তাই । পদান্তে অনুপ্রাস সংস্কৃতে নেই—কিন্তু প্রাকৃত, বৈষ্ণব পদাবলীতে রয়েছে । উত্তরাধিকার সূত্রে বাংলা ছন্দও তাই পাই ।

প্রাকৃত ভাষায় রচিত কবিতাগুলো প্রধানতঃ "পঙ্খটিকা" ছন্দে রচিত । প্রাকৃত পৈঙ্গলে পঙ্খটিকার বিবিধ রূপকে ভিন্ন ভিন্ন ছন্দ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে । প্রতিটি পর্ব যদি 'দীর্ঘস্বর' দিয়ে আরম্ভ হয়ে থাকে তবে তাকে "দোষক" ছন্দ বলা হয়—

পিংগজ- / টা বলি / ঠারিঅ / গঙ্গা //

ধারিঅ / গা অরি / জেন অ- / ধংগা //

(অন্ত্যানুপ্রাস লক্ষণীয়)

শেষ পর্ব দুটো "দীর্ঘস্বরের" বদলে যদি দুটো "লঘুস্বর" এবং একটি "দীর্ঘস্বর" থাকে তবে তাকে "মোদক" ছন্দ বলা হয়—

গঞ্জউ মেহ কি অম্বর সাগ্নর ।

ফল্লউ গীব কি বুল্লউ ভাগ্নর ॥

এক্লউ জীঅ পরাহিণ অগ্নহ ।

কীলউ পাউস কীলউ যগ্নহ ॥

“পঞ্চাটিকা”র “দোষাক”রূপে প্রতিটি দ্ব্যমাত্রার “অতিপর্ব” থাকলে তাকে “তারক ছন্দ” বলা হয়—

গব মঞ্জরি লিঞ্জিঅ / চুঅহ গাচ্ছে ।

পরি ফুল্লিঅ কেসদ্ গ / আ বণ কাচ্ছে ।

প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ পর্বের প্রারম্ভে দীর্ঘস্বর থাকলে এবং বাকী সমস্ততে হ্রস্বস্বর থাকলে—পঞ্চাটিকাকে “একাবলী” ছন্দ বলা হয় ।—

সো জণ / জনমউ / সো গুণ- / মন্তউ

জে কর / পরউঅ- / আর হ- / সন্তউ ।

পঞ্চাটিকার শেষাঙ্গের ছাড়া যদি সমস্ত স্বর হ্রস্ব হয়—তবে তাকে “সরভ” বলে—

তরল কমলদল সরিজদ্ অণঅণা

সরঅ সমঅ সসি স্-সরিস বঅণা ।

তুলনীয় বিদ্যাপতি—

কাজরে রঞ্জিত ধনি ধবল নয়ন বর

ভ্রমর ভুলল জন্ বিমল কমল পর ॥

চৰ্চা— কাআ / তরুবর / পণ্ড বি- / ডা-ল- ।

চণ্ডল / চিএ- / পইঠো- / কাল- ॥

পঞ্চাটিকার বৈশিষ্ট্য :

১) এই ছন্দে চরণে মিল রয়েছে ।

২) দীর্ঘ-স্বরকে দ্ব্যমাত্রা এবং হ্রস্বস্বরকে একমাত্রা ধরতে হবে এবং প্রতিটি চরণে ৬টি মাত্রা থাকলেই হল । ১৬ মাত্রাকে ৪টি পর্ব ভাগ করা যায় । দীর্ঘস্বর বেশি থাকলে অক্ষরের সংখ্যা কম থাকে এবং লঘুস্বর বেশি থাকলে অক্ষরের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি থাকবে ।

বৈষ্ণব-পদকর্তারা এই নীতির পরিসর বৃদ্ধি করেছেন—

তাল ফ- / লা দাঁপ গুদ্রুমতি সরসম্

কিম্ বিক- লী কুর্ - // যে কুচ কলসম্ । ৪ ৪ ৪ ৪ ৩

প্রাকৃতে ছিল $৪+৪+৪+৪=১৬$ । বৈষ্ণব পদকর্তারা করেছেন $১৫ (৪+৪+৪+৩)$; আবার অনেক সময় ১৬ মাত্রাও করেছেন । যখন ১৫ মাত্রা করেছেন তখন দীর্ঘস্বরকে “হ্রস্ব” করেছেন । এই পনের থেকে আরও ১ মাত্রা কমিয়ে ১৪ মাত্রা করে বৈষ্ণব

পদকর্তা **পন্ন্যারের** সৃষ্টি করেছেন ।

বদনে দরশন দিয়া দগধে পরাগ

রতিরস না জানয়ে কান্দু সে গোঙার=১৪

এখানে প্রতিটি দীর্ঘস্বরকে ১ মাত্রা করে ধরে ১৪ মাত্রা করেছেন ।

প্রাকৃতের দীর্ঘ-ত্রিপদী রজব্দুলিতে অনুসৃত হয়েছে—

জই মিত্ত ধনেসা / সসুদর গিরীসা

তছ বিহু পিৎখন / দীস ।

তুঃ বিদ্যাপতি :

কাম কন্দু ভরি

কনয়া শম্ভু পরি

চারত সুধনীর ধারা ।

গোবিন্দ দাস :

গরজ তরজ মন

রোষে বরিষ ঘন

সংশয় পড়ু অভি / সার ।

রবীন্দ্রনাথ :

নীল আকাশে

তারকা ভাসে

যমুনা গাওত তান

পাদপ মরমর

নিঝর বরঝর

কুসুমিত বাল্লি বি / গান ।

(ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী)

পতন অভ্যাস

বন্ধুর পন্থা

যুগ যুগ ধাবিত / যাত্রী ।

হে চির-সারথি

তব রথচক্রে

মুখরিত পথদিন / রাহি ।

প্রাকৃত দীর্ঘ চৌপদী : ৮+৮+৮+৬, ৭+৯+৮+৬, ৭+৯+৮+৭

৮+৮+৮+৭, ৮+৮+৮+৮ পর্বে প্রাকৃতে দীর্ঘ চৌপদী রচিত হয় । প্রাকৃতে

এই দীর্ঘ চৌপদীকে “জলহরণা” ছন্দ “চাউবোলা” ছন্দ এবং “পদ্যাবতী” ছন্দ

বলা হয়েছে—

চলদ্—দমকি বলদ্ / ধূলকি ধূলকি করি / করি চলিআ ।

বর মলদ্ সঅল কমল / বিপথ হিঅঅ সল / হমীর বীর জব / করি চলিআ ।

(জলহরণা)

(সব মাত্রাগুলো লঘুস্বর ; দুই মাত্রার 'অতিপব' ।)

রে ধনি মন্ত ম / তংগজগামিনি / খংজন নোঅনি / চন্দ্রমুহী

চংচল জুধবণ / জাতণ জানহি / ছটল সমপ্পহি / কা ই নহী ।

(এখানে প্রত্যেক পর্বাধে দীর্ঘস্বরের প্রয়োগ করা হয়েছে)

(চাউবোলা)

বৈষ্ণবপদাবলী :

অধর সদুধা ঝরদ্ / মুরল তরঙ্গিনী / বিগলিত রঙ্গিনী / হৃদয় দুকুল

৮+৮ ৮+৬

মাতল নয়ন / ভ্রমর জনি ভ্রমি ভ্রমি / উড়ত পড়ত শ্রুতি / উতপল ফুল

৮+৮+৮+৬

(গোবিন্দ দাস)

রবীন্দ্রনাথ :

কেদারার পরে চাপি / ভাবি শূদ্ধ ফিলসাফি

নিতান্তই ছুপি ছুপি / মাটির মানুষ=

৮+৮+৮+৬

শিখা : প্রাকৃতির ও মাত্রার 'শিখা' ছন্দের সঙ্গে পদাবলীর ও মাত্রার ছন্দের সাদৃশ্য ঘনিষ্ঠ ।

ফুলিঅ মহদ্ / ভমর বহদ্ / রঅণি পহদ্ / কিরণ লহদ্ / অব অরুদ- / সন্ত

৫+৫+৫+৫+৫ ২

তুঃ বিদ্যাপতি :

খনরি খন / মহাঘি ভই / কিছু অরুদন / নয়ন কই / কপটে ধরি /

মান-ন সম্ ! মান-লে : হী— ।

৫+৫+৫+৫+৫+২

জয়দেব :

বদসি যদি / কিণ্ডিদিপি / দন্তরুচি- / কৌমদী- /

হরতি দর / তিমিরমতি / ঘো-রম্ । ঐ ছন্দে রচিত ।

রবীন্দ্রনাথ :

শ্রাবণ ঘন / গহন মোহে / গোপন তব / চরণ ফেলে।

একদা তুমি / অঙ্গ ধরি / ফিরিতে নব / ভবনে।

পঞ্চ : শরে- / ভঙ্গ : করে- / করেছ : একি / সন্ন্যাসী

ঐ ছন্দে রচিত।

রবীন্দ্রনাথ “ভানুসিংহের পদাবলী”তে ৫+৫+৫+৫+২ কে ৫/৪/৫/৪/৩ করেছেন—

৫ ৪ ৫ ৪
আ-জ্ঞ-সাঁখি / ম-হ-ম-হ- / গা-হে পিক / কু-হ- কু-হ- /

এভাবে যদি প্রাকৃত ছন্দের আলোচনা করা যায় তবে দেখতে পাওয়া যাবে যে প্রাকৃত ছন্দই বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা কাব্যে প্রবেশ করেছে।

ছন্দোলিপি

ছন্দ বিচার করবার সময় মনে রাখতে হবে—

- ১) প্রথমত ছন্দের ‘জাত’ নির্ণয় করতে হবে—অর্থাৎ ‘চালের’ দিকের চেয়ে ‘চলনের’ দিকে দৃষ্টি দিতে হবে—অর্থাৎ পঙ্ক্তিগুলো দ্রুত চলছে না ধীরে চলছে না বিলম্বিত লয়ে চলছে। এই ‘চলন’ ধরতে পারলে ছন্দের জাত নির্ণয় করা যাবে। বেরিয়ে পড়বে—তা অক্ষরবৃত্ত, না মাত্রাবৃত্ত, না স্বরবৃত্ত।
- ২) জাত নির্ণয়ের পর চরণকে পর্বে ও পর্বঙ্গে ভাগ করতে হবে।
- ৩) ‘অতি পর্ব’ ও ‘অপূর্ণ পর্ব’ নির্দেশ করতে হবে।
- ৪) পর্বগুলো সমমাত্রিক কি অসমাত্রিক তা নির্দেশ করতে হবে।
- ৫) তারপর প্রতিটি জাতের ছন্দের বৈশিষ্ট্য অনুসারে মাত্রা নিরূপণ করতে হবে। মাত্রা বিচারের সময়ে ‘অপূর্ণ পর্ব’কে ছন্দের মাত্রার মধ্যে ধরতে হবে। অতি-পর্বের মাত্রা ছন্দের মাত্রা থেকে বাদ দিতে হবে।
- ৬) কল্পপদী—অর্থাৎ ‘একপদী / দ্বিপদী / ত্রিপদী / চতুষ্পদী’র উল্লেখ করতে হবে—
 - ক) আমাকে মা, যখন তুমি ঘুম পাড়িয়ে রাখ
 - খ) সান্ধ্য বসুন্ধরা তন্দ্রা হারায়
 - গ) হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান

উপরে তিনটি পঙ্ক্তি দেওয়া হয়েছে। প্রথমটির চলন—দ্রুত যে কদম কদম বাড়িয়ে যাচ্ছে ; সূত্রাং এটা স্বরবৃত্ত বা স্বাসাঘাত প্রধান, দ্রুত লয়ের ছন্দ।

দ্বিতীয় পঙ্ক্তি হেলেদুলে গজেন্দ্রগামিনী হয়ে চলেছে—সুতরাং মাত্রাবৃত্ত
(কলাবৃত্ত) বিলম্বিত লয়ের ছন্দ।

তৃতীয়টি গতি দ্রুতও নয় এবং বিলম্বিতও নয়—ধীরলয় অতএব অক্ষরবৃত্ত
ছন্দ। জাত ত নির্ণয় হল, এবারে পর্ব পর্বাক্ষ ভাগ করে মাত্রা নিরূপণ করা হচ্ছে—

ক) $\begin{matrix} 8 & 8 & 8 & 2 \end{matrix}$
অর্মাকৈ মর্মা / যর্থন তুর্মি / যুর্ম পর্পিড়িয়ে / রাখ
 $8+8+8+2=18$ লঘু পয়ার।

তিনটি পদ্যাক্ষ পর্ব এবং অপদ্য পর্ব (২ মাত্রা)।

খ) $\begin{matrix} ৮ & ৬ \end{matrix}$
 $\begin{matrix} ২১ & ১২১১ & ২১ & ১১১ \end{matrix}$
সাম্য বসুন্ধরা / তদ্ভা হারায় = $৮+৬$

মাত্রাবৃত্ত লঘু দ্বিপদী।

গ) $\begin{matrix} ৮ & ১০ \end{matrix}$
 $\begin{matrix} ১ & ১১১১ & ১১ & ১ & ১১১ & ১১ & ১১১১ \end{matrix}$
হে মোর দৃভাগা দেশ / যাদের করেছ অপমান

$৮/১০$ অক্ষরবৃত্ত

দীর্ঘ (মহা) পয়ার

যব গোধূলি সময় / বেলি

যব=অতিপর্ব; গোধূলি সময়=পর্ব; বেলি=অপদ্য পর্ব। পর্বের মাত্রা সংখ্যা
নিরূপণের সময় যব (২ মাত্রা) বাদ দিতে হবে।

পরিশিষ্ট

এই অংশে রবীন্দ্রনাথের কিছ্ উক্তি উদ্ধৃত করে মাত্রার সাধারণ নীতির ব্যতিক্রম দেখান হচ্ছে।

ক) অক্ষরের সংখ্যা গণনা করে ছন্দের ধ্বনি মাত্রা বাংলায় চলে না।

অথবা

“অক্ষরের সংখ্যা গণনা করে ছন্দের ধ্বনিমাত্রা বাংলায় চলে না” রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির তাৎপর্য বঝিয়ে দিয়ে ঐ উক্তির সূত্র অনুসারে নিম্নলিখিত পঙ্ক্তি-দ্বটির ধ্বনি মাত্রা নিরূপণ করঃ—

“মাঝে মাঝে দীর্ঘস্বাস ছাড়িয়া উৎকট

হঠাৎ ফুকারি উঠে- হিং টিং ছট্।

এই পঙ্ক্তি দুটোর ছন্দ—অক্ষরবৃত্ত বা মিশ্রকলাবৃত্ত বা তান প্রধান ছন্দ। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের সাধারণ নিয়ম হচ্ছে—প্রতিটি অক্ষর ১ মাত্রার এবং এই ছন্দে ‘ঃ’, ‘ং’ এবং ‘ৎ’ এর মাত্রা গণনা করা হয় না। কিন্তু আলোচ্য পঙ্ক্তি দুটো হচ্ছে ঐ সূত্রের মর্ন্তমান ব্যতিক্রম বা বিদ্রোহী। এখন পঙ্ক্তি দুটোর ছন্দোলিপি নির্ণয় করে ব্যতিক্রম দেখান হ’ল—

মাঝে মাঝে দীর্ঘস্বাস / ছাড়িয়া উৎকট

হঠাৎ ফুকারি উঠে / হিং টিং ছট্।

প্রথম পঙ্ক্তিতে ১৫ অক্ষর এবং দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতে ১২টি অক্ষর আছে। কিন্তু অক্ষরবৃত্তের সূত্র অনুসারে—‘ঃ’ এবং ‘ং’ এর মাত্রা গণনা করে চলে না। যদি তাই হয় তবে এ ছন্দ পতন ঘটবে—তালও কেটে যাবে। সুতরাং ছন্দ পতন যাতে না ঘটে তার ব্যবস্থা কি?

৮

৬

১১ ১১ ১১১১ ১ ১১ ১২

মাঝে মাঝে দীর্ঘস্বাস / ছাড়িয়া উৎকট = ৮+৬=১৪

(এখানে ‘ঃ’ এর কোন গোরব নেই ‘উ’ এর সঙ্গে লেপেট গিয়ে ১ মাত্রার হয়েছে)

৮

৬

১১ ১১ ১ ১১ ১১ ১১ ২

হঠাৎ ফুকারি উঠে / হিং টিং ছট্ = ৮+৬=১৪

এখানে ‘ঃ’ এর পর রেশ রয়েছে—এখানে ‘ঃ’ এর পৃথক সঙ্গী রয়েছে—ফলে ১ মাত্রা বলে গণ্য হয়েছে এং ‘ং’ ও মাত্রাগোরব লাভ করেছে।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের উক্তি যথার্থ। আমরা আরও তার নিজের দিচ্ছি—

“ঘুম্ পাড়ানি মাসি পিসি

ঘুম্ দিয়ে যাও-

কান পেতে শুনলেই বোঝা যায়—১ম ঘুম=১ মাত্রা দ্বিতীয় ঘুম=২ মাত্রা (ঘুম্‌উম্)। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—বাংলা ছন্দ বাঙালি মেয়ের খেঁপার মতো কখনো এলো কখনো টাইট। প্রথম ঘুম—টাইট খেঁপা; দ্বিতীয় ঘুম—এলো খেঁপা।

খ) “বাঙালি আবৃত্তিকার সাধুভাষা-প্রচলিত ছন্দে নিজের উচ্চারণ-সম্মত মাত্রা রাখেনি”—এই উক্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কি ভাবে নিম্নলিখিত পঙ্ক্তি-দুটির মাত্রা নিরূপণ করেছেন তা বদ্বিধিয়ে দাও—

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।

কাশীরাম দাস কহে শুন পুণ্যবান্ ॥

প্রচলিত রীতি মতে ওপরের ঐ পঙ্ক্তি দুটির ছন্দোলিপি হচ্ছে—

৮

৬

মহাভারতের কথা / অমৃত সমান্ । ৮+৬=১৪

কাশীরাম দাস কহে / শুন পুণ্যবান্ ॥ ৮+৬=১৪

লঘু পয়ার (অক্ষরবৃত্ত)

রবীন্দ্রনাথ বলেন যে পয়ারের বদ্বনি ঠাস বদ্বনি নয়, তাকে বাড়ানো-কমানো যায়। সুদূর করে টেনে পড়বার সময় কেউ যদি যতির যোগে পয়ারের প্রথম ভাগে দশ ও শেষ ভাগে আট মাত্রা করে পড়ে তবু পয়ারের প্রকৃতি বজায় থাকে—

১০

৮

“মহাভারতের কথা ০০ / অমৃত সমান ০০ = ১০+৮=১৮

কাশীরাম দাস কহে / শুন পুণ্যবান্” ০০ = ১০+৮=১৮

মহাপয়ার (রবীন্দ্রনাথের মতে)

(০০=২ মাত্রা করে বাড়তি ৪ মাত্রা তিনি দিয়েছেন)

গ) চোন্দ মাত্রার কোন কবিতার চাল যদি দুর্লভ—চাল হয় তবে দেখা যাবে যে পয়ারের কোলিন্য আর বজায় থাকে না—কেন? তা উদাহরণ দিয়ে বদ্বিধিয়ে দাও।

এই উক্তিটি রবীন্দ্রনাথ করেছেন তাঁর “ছন্দ” বইয়ে। এবং তিনি তাঁর উক্তির

সমর্থনে কবিতা রচনা করে দেখিয়ে এর যথার্থ নিরূপণ করেছেন।

কেন / তার / মুখ / ভার / বুক / ধুক / ধুক / ০০

চোখ / লাল / লাজে / গান / রাঙা / টুকটুক / ০০

পয়ারের পবের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ৮+৬

(প্রথমটির ৮ মাত্রা, দ্বিতীয়টির ৬ মাত্রা কিন্তু ঐ পঙ্ক্তি দুটোকে সে-ভাবে পর্ব ভাগ করা চলে না ; ফলে পয়ারের যে কৌলিন্য তা রক্ষা না করে ভঙ্গ কুলীন হয়ে গেছে।

ঘ) পয়ার কাকে বলে ? তিন রীতির তিনটি পয়ারের দৃষ্টান্ত দাও।

প্রবোধচন্দ্র পয়ারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—“পয়ার” একটি ছন্দ-আকৃতির নাম, ছন্দ প্রকৃতির নাম নয়। যে ছন্দ পঙ্ক্তির মোট মাত্রা সংখ্যা চোদ্দ এবং যার আট মাত্রার পরে অর্থযতি ও বাকি ছয় মাত্রার পরে পূর্ণযতি, তারই নাম পয়ার। সেইজন্যই ছান্দসিক কবি সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন—

আট-ছয় আট-ছয়

পয়ারের ছাঁদ কয়” ছন্দ সরস্বতী, ভারতী

১৩২৫/বৈশাখ/পৃঃ ৫।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—“পয়ারের প্রকৃত রূপ চোদ্দটা অক্ষরে নয়, সেটা প্রথম অংশের আট অক্ষর ও দ্বিতীয় অক্ষরের পরবর্তী দুই যতি” ছন্দ / ছন্দের হসন্ত-হলন্ত।

অর্থাৎ যে ছন্দোবন্ধের প্রতি পঙ্ক্তিতে আট মাত্রার পরে এক যতি এবং ছয় মাত্রার পরে এর একটি যতি, দেওয়া হয় তাকেই বলা হয় পয়ার। রবীন্দ্রনাথ এছাড়া আরও বলেছেন—“আধুনিক বাংলা ছন্দে সবচেয়ে দীর্ঘ পয়ার আঠার অক্ষরে গাঁথা। তার প্রথম যতি পদের মাঝখানে আট অক্ষরের পরে, শেষ যতি দশ অক্ষরের পরে পদের শেষে।”

ছন্দ। ঐ।

এই উক্তিগুলো থেকে বোঝা যায় যে ‘পয়ার’ শব্দটিকে তিনি একটি “ছন্দোবন্ধ” এর নাম হিসেবেই গ্রহণ করেছেন। দীর্ঘ পয়ারকে কখনো “মহাপয়ার” আবার কখনো “বড়োপয়ার” বলেছেন। এবং আট-ছয় মাত্রাবিভাগের পয়ারকে (লঘুপয়ার) “ছোট পয়ার” বলেছেন ;

ছন্দ।

আবার তিনি লিখেছেন—এই প্রবন্ধে আমি দ্বিপদী প্রভৃতি পয়ার-জাতীয় সমস্ত বৈমাত্রিক ছন্দকেই “পয়ার” নাম দিচ্ছি।

ছন্দ/ছন্দের হসন্ত-হলন্ত।

এই থেকে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ ‘পয়ার’ শব্দটির একাধিক অর্থে ব্যবহার করেছেন।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি 'পয়ার'কে বলেছেন—ছন্দের বন্ধু বিশেষ, আরার কখনো কখনো পয়ারের অর্থ করেছেন—ছন্দের রীতি বিশেষ।

তবে 'তিন' রীতিতে যে 'পয়ার প্রবন্ধ' রচনা করা চলে সে বিষয়েও তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেছেন—

“নিম্নে যমুনা বহে স্বেচ্ছ শীতল—

উর্ধ্বে পাষাণতট, শ্যাম শিলাতল। (কলাবৃত্ত)

নিম্নে, স্বেচ্ছ এবং উর্ধ্বে এই কয়েকটি শব্দে 'তিন' মাত্রা গণনা না করলে পয়ার ছন্দ ছন্দ থাকে না।” “ছন্দ”।

দলবৃত্ত পয়ারের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন—

“এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যখানে চর,

তারি মধ্যে বসে আছেন শিব সদাগর।”

এটাও পয়ার, তবে চোদ্দ অক্ষরের সীমানা পেরিয়ে গেছে।

ছন্দ

আট-ছয় মাত্রা বিভাগের পয়ার প্রকৃতি ভেদে তিন ধরণের—

ক) আমি যদি / জন্ম নিতেম / কালিদাসের / কালে $8+8+8+2=18$

দৈবে হতেম / দশম রত্ন / নব রত্নের / মালে = $8+8+8+2=18$

(স্বরবৃত্ত/শ্বাসাঘাত প্রধান)

খ) বর্ষার নিব্বারে / অঙ্কিত কায় = $৮+৬=১৪$

দুই তীরে গিরিখাল / কতদূর যায়। = $৮+৬=১৪$

(মাত্রাবৃত্ত/কলাবৃত্ত/ধ্বনি প্রধান)

গ) মহাভারতের কথা / অমৃত সমান্। $৮+৬$

কাশীরাম দাস কহে / শূনে পদ্যবান। $৮+৬$

(অক্ষরবৃত্ত/মিশ্রকলাবৃত্ত/তানপ্রধান)

ঙ) “বাংলা স্বরবর্ণের সজীবতা, একে কোনো কড়া নিয়মের চাপে আড়ষ্ট করে তাকে সর্বত্র সমান ভাবে ব্যবহার করা উচিত—এমত চালালে বাংলা ভাষাকে ফাঁকি দেওয়া হবে। শব্দকনো অমসত্ত্বের মধ্যেই সাম্য, কিন্তু সরস আমার মধ্যে বৈচিত্র্য, ভোজে কোন্টার দাম বেশি তা নিয়ে তর্ক অনাবশ্যক।”

রবীন্দ্রনাথ (ছন্দ পৃঃ ৩২২ র চ/২১) এই উক্তিটির কি ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তার আলোচনা করি।

রবীন্দ্রনাথ এই উক্তিটি করেছেন বাংলা ছন্দের উচ্চারণ সম্বন্ধে। বাংলা উচ্চারণে স্বরের ধ্বনিতে টান দিয়ে অতি সহজেই বাড়ানো কমানো যায়—এতে তার

গৌরব লাঘব হয় না। আবার ‘৯’ এর উচ্চারণেও কোনো নিয়মের চাপে তাকে আড়ষ্ট করা চলে না। উভয় ক্ষেত্রেই তিনি উদাহরণ দিয়ে বিবরণটি পরিষ্কার করে দিয়েছেন—

“মনে পড়ে দ্দুইজনে জুই তুলে বাল্যে

নিরালয় বনছায় গেঁথেছিন্দু মাণ্ডে।

দৌহার তরুণ প্রাণ বেঁধে দিল গন্ধে—

আলোয়-আঁধারে-মেশা নিভৃত আনন্দে।”

এখানে “দ্দুই” “জুই” আপন আপন ‘উ’কারকে দীর্ঘ করে দ্দুই সিলেবল হয়েছে, এতে সন্দেহ নেই—কিন্তু—

“এই যে এল সেই আমারি স্বপ্নে দেখা রূপ

কই দেউলে দেউটি দিল, কই জ্বালালি ধূপ।”

এখানে ‘এই’, ‘সেই’, ‘কই’ হ্রস্ব হয়ে পড়েছে।

তিনি আরও বলেছেন—‘বৎসর, উৎসব’ প্রভৃতি খণ্ড ৭-ওয়ালা কথাগুলোকে আমরা ছন্দের মাপে বাড়াই কমাই, এ রকম চাতুরী সম্ভব হয় যেহেতু খণ্ড ৭-কে কখনো আমরা চোখে দেখার সাক্ষ্য এক অক্ষর ধরি, আবার কখনো কানে শোনার দেহাই দিয়ে আধ অক্ষর বলে চালাই—প্রবন্ধ লেখক (প্রবোধচন্দ্র) এই অপবাদ দিয়েছেন। সেই অভিযোগ খণ্ডন করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঐ উক্তি করে উদাহরণ সহ তাঁর বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে অপবাদ একেবারে ভিত্তিহীন—‘বৎসর’ প্রভৃতি শব্দকে রবীন্দ্রনাথ ঠাট্টা করে তুলনা করেছেন গোঞ্জির সঙ্গে—মধুপুত্র স্বাস্থ্যকর হাওয়া দেহ এক-আধ ইঞ্চি বাড়লেও ক্ষতি নেই আবার শহরে এসে এক-আধ ইঞ্চি কমলেও সহজে খাপ খেয়ে যায়। “কান যদি সম্মতি না দিত তাহলে কোনো কবির সাধ্য ছিল না ছন্দ নিয়ে যা খুঁশি তাই করতে পারে—

“বৎসরে বৎসরে হাঁকে গোমায়ু

যায় আয়ু যায় আয়ু যায় যায় আয়ু”

১ ১ ১

এখানে ‘বৎসরে’ (বৎ + স + রে) ৩ মাত্রা। কিন্তু সেতারে মীড় লাগাবার মতো অল্প একটু টানলে বেসুর লাগে না—

“সখা-সনে উৎসবে বৎসর যায়

শেষে মরি বীরহের ক্ষুৎ পিপাসায়”

এখানে ‘উৎসবে’ (৪ মাত্রা) ‘বৎসর’ (৩ মাত্রা) ‘ক্ষুৎ’ (১ মাত্রা)।

‘একটি’, ‘তিনটি’, ‘একটু’ শব্দগুলি হ্রস্বমধ্য, ‘গে লমাল’, ‘তোলপাড়’ও সেই জাতের। অথচ হ্রস্ব ধ্বনি লাঘবতার অভিযোগে ওদের মাত্রা জরিমানা দিতে হয়নি।

তিন মাত্রা ও চারমাত্রার গৌরবেই রয়ে গেল। কেউ কেউ বলেন, কেবল মাত্রা অক্ষর গণনার দোহাই দিয়েই এরা মান বাঁচিয়েছে, অর্থাৎ যদি যুক্ত অক্ষরের ছাঁদে লেখা যেত তাহলেই ছন্দে ধ্বনির কর্মতি ধরা পড়ত। আমার বক্তব্য এই যে, চোখ দিয়ে ছন্দ পড়া আর বাইসিকল এর চাকা দিয়ে হামাগুড়ি দেওয়া একই কথা, ওটা হবার জো নেই। বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা বোঝা যাবে।

টোট্কা এই মৃষ্টিযোগ লট্‌কানের ছাল

সিট্‌কে মৃদু খাবি, জ্বর আটকে যাবে কাল।

বলে রাখা ভালো এটা ভিষক-ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন নয়, সাহিত্য ডাক্তারের বানানো ছড়া, ছন্দ সম্বন্ধে মত সংশয় নিবারণের উদ্দেশ্যে,—একটা

একটি কথা শুনাবারে তিনটে রাত্রি মাটি,

এরপরে ঝগড়া হবে, শেষে দাঁত কপাটি।

অথবা—

একটি কথা শোনো, মনে খট্‌কা নাহি রেখে,

টোট্‌কা মাছ জুটল না তো, শট্‌কি দেখো চেখে।

শেষের তিনটি ছড়ায় অক্ষর গুণগতি করতে গেলে দৃশ্যত পয়ারের সীমা ছাড়িয়ে যায়, কিন্তু তাই বলেই যে পয়ার ছন্দের নির্দিষ্ট ধ্বনি বেড়ে গেল তা নয়। আপাতত মনে হয়, এটা যথেষ্টাচার। কিন্তু হিসেব করে দেখলেই দেখা যাবে ছন্দের নীতি নষ্ট করা হয়নি। কথাটা লক্ষ্য করবার বিষয় যে, হসন্তবর্ণের হ্রস্ব বা দীর্ঘ যে মাত্রাই থাক পাঠ করতে বাঙালি পাঠকের একটুও বাঁধে না, ছন্দের ঝোঁক আপনাই অবিলম্বে তাকে ঠিকমতো চালনা করে—

পাংলা করিয়া কাটো কাংলা মাছেরে,

উৎসুক নাৎনি যে চাহিয়া আছে রে।

এই ছড়াটা পড়তে গেলে বাঙালি নিঃসংশয়ে স্বতই খণ্ড-ত-এর পদবর্তী স্বরবর্ণকে দীর্ঘ করে পড়বে। আবার যেমনি নিম্নের ছড়াটি সামনে ধরা যাক—

পাংলা করি কাটো প্রিয়ে, কাংলা মাছটিরে,

টোট্‌কা তেলে ফেলে দাও সরসে আর জিরে,

ভেট্‌কি যদি জোটে তাহে মাখো লংকাবাঁটা

যত্ন করে বেছে ফেলো টুকুরো যত কাঁটা।

অমনি প্রাক্‌হসন্ত স্বরগুলিকে ঠেসে দিতে এক মৃদুতও দৌঁর হবে না।

তাই রবীন্দ্রনাথের ঐ উক্তি—যথার্থ এবং দ্বিমত পোষণ করা কোনো মতেই চলে না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অলঙ্কার

অলঙ্কার : সংস্কৃত ‘অলম্’ শব্দের অর্থ হচ্ছে ভূষণ, অতএব যে বস্তু দিয়ে ‘অলম্’ সূচিত হয়, তাকেই অলঙ্কার বলা হয়। অলঙ্কার শব্দের দুটো অর্থ—১) সৌন্দর্য। সৌন্দর্য অর্থটি ব্যাপক, এবং গৌণ বা সংকীর্ণ অর্থ হচ্ছে ২) অনুপ্রাস, উপমাাদি অলঙ্কারগুলো।

অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে ‘সৌন্দর্য-শাস্ত্র’ বা ‘কাব্য-সৌন্দর্য-বিজ্ঞান’। ইংরাজীতে একে বলা হয় Aesthetic of Poetry। অনুপ্রাস উপমাদিকে বলা হয় Figures of speech। “কাব্য মীমাংসা” গ্রন্থে রাজশেখর অলঙ্কার-শাস্ত্রকে বলেছেন—সপ্তম-বেদাঙ্গ। তিনি আরও বলেছেন যে, এই শাস্ত্রের পরিবিজ্ঞান ছাড়া বেদার্থেরও সম্যক জ্ঞান হয় না—“উপকারকত্বাদ্ অলঙ্কারঃ সপ্তম্ অঙ্গম্ ইতি যাব্য বরীষঃ। ঋতে চ তৎস্বরূপ-বিজ্ঞানাদ্ বেদার্থনিবগতিঃ”

কাব্যমীমাংসা ২য়/অঃ/পৃঃ ৩

সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা মানবদেহের সঙ্গে কাব্য-দেহের তুলনা করেছেন। রমণীদেহের সঙ্গে কটক-কুণ্ডলাদির যেমন সম্বন্ধ ঠিক তেমনি সম্বন্ধ রয়েছে কাব্য দেহের সঙ্গে—অনুপ্রাস, রূপক যমকাদি প্রভৃতি অলঙ্কারগুলোর। কটক-কুণ্ডলাদি যেমন নারীদেহের সৌন্দর্যবৃদ্ধি করে ঠিক তেমনি রূপক-উপমাদি কাব্য দেহের চারদুঃ বৃদ্ধি করে। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর সাহিত্যমীমাংসক ধারাধিপতি ভোজদেব বলেছেন—শব্দ ও অর্থ হচ্ছে কাব্যের শরীর, রস (ধ্বনি) কাব্যের আত্মা, ওজঃ, প্রসাদ, মাধুর্য প্রভৃতি গুণগুলো হচ্ছে কাব্যদেহের শৌর্য, দোষগুলো—কাণত্বাদির মতো, রীতিগুলো হচ্ছে—মানবদেহের অবয়ব সংগঠনের মতো এবং অলঙ্কার হচ্ছে—কটক-কুণ্ডলাদির মতো। “কাব্যস্য শব্দার্থো শরীরম্, রসাদিশ্চাত্মা, গুণাঃ শৌর্যদয় ইব, দোষাঃ কাণত্বাদিবৎ, রীতিরঃ অবয়ব-সংস্থান-বিশেষেবৎ, অলঙ্কারশ্চ কটক-কুণ্ডলাদিবৎ।” সাহিত্যদর্পণ, ১/২ বৃতি।

কাব্যমীমাংসকার রাজশেখর কাব্যপদ্যরূষের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন—শব্দ এবং অর্থ তোমার দেহ। সংস্কৃত তোমার, তোমার বাহুবুয় প্রাকৃত ভাষা-নির্মিত।

তোমার জঘনদেশ অপভ্রংশ ভাষাময়, তোমার পদযুগল পৈশাচ ভাষা-নির্মিত। তুমি সমতা, প্রসাদ, মাধুর্য এবং ওজোগুণযুক্ত। তোমার বচন উত্তীর্ণ নৈপুণ্যে ভূষিত। রস তোমার আত্মস্বরূপ, তোমার রোমরাজি ছন্দোময়, অনুপ্রাস এবং উপমা প্রভৃতি তোমাকে অলঙ্কৃত করছে।

তাই দেখতে পাই—দৈনন্দিন জীবনের ভাষা এবং সংবাদপত্রের ভাষা থেকে কাব্য-সাহিত্যের ভাষার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। দৈনন্দিন জীবনের ভাষা নিরাভরণা—আটপোরে। সংবাদপত্রের ভাষা বার্তাধর্মী। কাব্যের ভাষা অলঙ্কৃত। সাহিত্যের ভাষা সম্পর্কে ‘হৃদয় দর্পণে’র রচয়িতা ভট্টনায়ক বলেছেন—

“শব্দ-প্রাধান্যম্ আশ্রিত্য তএ শাস্ত্রং পৃথক বিদুঃ

অর্থো তত্ত্বেন যদুক্তে তু বদন্ত্যা খ্যানম্ এতয়োঃ

হ্ময়োগুণভূত্বৈ ব্যাপার প্রাধান্যো কাব্যগীর্ভবেৎ ॥”

অর্থাৎ বেদে এবং আইনের অনুশাসনে শব্দই হল প্রধান, তাকে পরিবর্তন করা যায় না, ইতিহাস এবং আখ্যানে ভাব এবং ঘটনাগুলোই প্রধান, সেগুলোকে কোন মতেই পরিবর্তন করা যায় না। কিন্তু যেখানে বাক্য এবং ভাব দুইই প্রকাশরীতির অনুগামী তখনই হয় কাব্যের সৃষ্টি। এখানে প্রকাশ ভংগিই গুরুত্বপূর্ণ, কথিত বাক্য বা ভাব নয়।

এই গুরুত্বপূর্ণ-ভংগিটিকেই আলংকারিকেরা বলেছেন— “বৈদ্যভংগি-ভংগিতি” এবং এই “বৈদ্যভংগি-ভংগিতি”ই হচ্ছে—বক্রোক্তি। ব্যবহার জীবনের কিছু সংখ্যক বস্তুর মধ্যেও কিছুটা “বৈদ্যভংগি-ভংগিতি” দেখতে পাই—যখন আমরা কোনো আমন্ত্রণ-পত্র পাঠাই তখন তার ভাষা আটপোরে না করে কিছু মার্জিত বাগী-ভংগি দিয়ে অলঙ্কৃত ভাষায় ব্যবহার করি……যেমন কোনো পণ্ডিত ব্যক্তি কোনো সভায় সভাপতিত্ব করবেন, তখন আমরা লিখিত—“বিদ্য পণ্ডিত শ্রী……… সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করতে সম্মত হয়েছেন……”

“অলঙ্কৃত” হচ্ছে শোভাবর্ধন করা। যে-বস্তু শোভাবর্ধন করে তাই ‘অলঙ্কার’। আচার্য দন্ডী বলেছেন—

“কাব্যশোভাকরান্ ধর্মান্ অলংকারান প্রচক্ষতে।”

কাব্যাদর্শ। ২/১.

আচার্য বামন বৃত্তিতে বলেছেন— “অলঙ্কৃতিঃ অলংকারঃ। করণব্যাংপত্ত্যা পুনঃ অলংকারশব্দোহয়ম্ উপমাদিষু বর্ততে।” অর্থাৎ অলঙ্কৃতি মাত্রই অলংকার। করণ-বাচ্যে ব্যাংপত্তি করে আবার এই অলংকার শব্দই উপমাদি বুদ্ধায়।

বামনের মতবাদ বিশ্লেষণ করলে আমরা পাই—১) অলংকার হচ্ছে—সৌন্দর্য।
 ২) অলংকার হচ্ছে—উপমাাদি বিশেষ সৌন্দর্য। এই সৌন্দর্য সম্বন্ধে What is Poetry” গ্রন্থে Watts Dunton বলেছেন—“The Poet must never forget that his final guest is beauty”.

অলংকারের শ্রেণী বিভাগ : ধারাধিপতি ভোজদেব তাঁর “শৃঙ্গার-প্রকাশ” গ্রন্থে বলেছেন—অলংকার ত্রিবিধ—অন্তরঙ্গ, বহিরঙ্গ এবং মিশ্র।

অন্তরঙ্গ— কেশবিন্যাস, দন্তপারিকর্ম, নখচ্ছেদ প্রভৃতি।

বহিরঙ্গ— বস্ত্র, মালা, কটক, কুণ্ডল, কেয়ূর প্রভৃতি।

মিশ্র— ধূপ, চন্দন, কুঙ্কুম, অলঙ্কৃত প্রভৃতি প্রসাধন বিলেপন।

বস্ত্র, মালা, কটক-কুণ্ডলাদি সৌন্দর্যবৃদ্ধির সহায়ক সন্দেহ নেই। স্নান, ধূপ, চন্দন, কুঙ্কুম, আলতা প্রভৃতি সৌন্দর্য সৃষ্টির পক্ষে অপরিহার্য, কিন্তু সব চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় হচ্ছে—কেশ বিন্যাস, দন্তপারিকর্ম, নখচ্ছেদ প্রভৃতি। কারণ কেশ যদি বিন্যাস করা না হয়, দাঁতগুলো যদি মৃত্তার মতো ঝক্ঝক্ না করে, আর নখগুলো যদি “বাঘনখ” যন্ত্রের মতো বড় বড় হয়, তাহলে কটক, কেয়ূর পরিধানে, কুঙ্কুম প্রভৃতি বিলেপনেও নারীদেহের চারদুহ ফুটে বেরুবে না। উপরন্তু অবয়ব গঠন হাতে হবে নিখুঁত, দেহের বরণও শ্যাম (তব্বী শ্যামা শিখর দশনা) বা দূধে আলতায় মেশান। এবং এই শ্রেণীর নারীদেহ থেকে একটা স্বাভাবিক সৌন্দর্য আপনাতেই ফুটে বেরুবে—এমনকি প্রসাধন বিলেপনের অপেক্ষাও সেই দেহ রাখে না। অলংকারের ক্ষেত্রেও তাই অনুভূত হয়।

অলংকারিকেরা কাব্যদেহে অলংকার যোজনায় ক্ষেত্রেও তিনটি শ্রেণীর কথা প্রকারান্তরে উল্লেখ করে বলেছেন—শব্দালংকার বহিরঙ্গ, অর্থালংকার অন্তরঙ্গ। শব্দালংকারের মধ্যে “অনুপ্রাস” যদি সীমার মধ্যে থাকে তবে অন্তরঙ্গ অলংকার হবে এবং সীমার বাইরে গেলে অর্থাৎ “পৃথগবস্ত্র নিবর্ত” হলে অট্টহাস হয়ে পড়বে। যেমন—

“ভূতানাথ ভূতসাথ দক্ষযজ্ঞ নাশিছে

রক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ট অট্ট হাসিছে”

এখানে এই অনুপ্রাস—অট্টহাসিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু “কেন বাজাও কাঁকন কন কন কত ছলভরে” এখানে অন্তরঙ্গ ও শ্রুতি মধুর হয়েছে। তাই দেখা যায় মহৎ কবির অনুপ্রাস, যমক প্রভৃতি বাহ্য অলংকারগুলোকে বর্জন করেছেন।

প্রয়োজনীয়তা : রমণীদেহে চারদুহ বৃদ্ধির জন্য যেমন কটক-কুণ্ডলাদির প্রয়োজন রয়েছে ঠিক তেমনি কাব্যদেহের চারদুহ বৃদ্ধির জন্য অলংকার যোজনায় প্রয়োজন

রয়েছে। তবে একথা স্মার্তব্য যে অলংকার কাব্যের 'আত্মা' নয়। যে নারীদেহের অবয়ব গঠন সুন্দোল ও সুন্দর এবং যৌবন দীপ্তিতে দীপ্যমানা সেই নারীদেহের মধ্যে একটা স্বাভাবিক দীপ্তি রয়েছে। সে-নারী দেহকে অলংকৃত না করলেও তার দীপ্তি ফুটে বেরুবুবেই। তেমনি কোনো সু-কাব্যকে অলংকৃত না করলেও তা যদি সত্যিকারের রসকাব্য হয়, তবে, তা পাঠক-পাঠিকা-চিত্তকে রসসিক্ত করে তুলবে। কাব্য-দেহের অন্তর্নিহিত লাভ্যকে ধরতে পেরেছিলেন বলেই আনন্দ বর্ধনাচার্য প্রমুখ ধর্মানবাদীরা 'ধ্বনি' সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বস্তু-ধ্বনি, অলংকারের ধ্বনি, অত্যন্ত তিরস্কৃত প্রভৃতিকে প্রাধান্য না দিয়ে "রসের ধ্বনি"কেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে তাঁরা রসের ধ্বনিকে প্রাধান্য দিলেও অলংকারকে নির্বাসিত করেন নি। অলংকারের প্রয়োজনীয়তাকে তাঁরা স্বীকার করে বলেছেন যে কাব্যের আত্মা হচ্ছে রসের ধ্বনি এবং অলংকার হবে তারই অনুগামী। আত্মার ঔচিত্য অনুযায়ী অলংকার যোজনা করতে হবে, নইলে কাব্য অনৌচিত্য দোষে দূষিত হয়ে পড়বে। শব্দ-শরীরে অলংকার যোজনা করলে তার ঔজ্জ্বল্য এতটুকুও বৃদ্ধি পাবে না, কারণ ঐ দেহে আত্মা নেই। যাক-শরীরকে অলংকৃত করলে হাস্যরসের খোরাক হয়ে দাঁড়াবে, সেখানেও আত্মার ঔচিত্য নেই। ফলে, কাব্যের আত্মস্বরূপ রসতত্ত্বের সম্ভাবও ঔচিত্য—এই দুটোকে অবলম্বন করে অলংকার যোজনা করে বিধেয়। যেমন—অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকের প্রথম অঙ্কে মহাকাব্য কালিদাস যেভাবে শকুন্তলাকে লাস্যময়ী বেশে আবির্ভূত করেছিলেন, তার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কারণ দৃশ্যমন্তের মনোহরণের জন্য শকুন্তলাকে নিরাভরণা হলে চলত না। আবার সপ্তম অঙ্কে শকুন্তলাকে লাস্যময়ী বেশে আবির্ভূত করা চলে না বলেই মহাকাব্য কালিদাস শকুন্তলাকে নিরাভরণা করে মহামতি মারীচের আগ্রমে উপস্থিত করেছেন। প্রথম অঙ্ক হচ্ছে সম্ভোগ্যের দৃশ্য এবং সপ্তম অঙ্কের প্রারম্ভ হচ্ছে বিপ্রলম্বের দৃশ্য সুতরাং বলা যেতে পারে প্রথম অঙ্কে রসদৃষ্টির পরিবেশ রক্ষার জন্য শকুন্তলার দেহকে অলংকারে ভূষিত করা একান্ত অপরিহার্য ছিল এবং সপ্তম অঙ্কে নিরাভরণাই হচ্ছে স্বাভাবিক অলংকার। তাই বলতে হয় রসই উপেয়, অলংকার তার উপায় মাত্র।

নিরলংকৃত স্বাভাবিক সৌন্দর্যের একটা মূল্য রয়েছে। কাব্য জগতে এই নিরলংকারকে স্বভাবোক্তির মূর্ত্যাদা দেওয়া হয়েছে। নিরলংকার বর্ণনাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ বর্ণনা এবং শ্রেষ্ঠ অলংকার—

“নানাবস্থং পদার্থানাং রূপং সাক্ষাদ্ বিবৃণ্বতী
স্বভাবোক্তিশ্চ জাতিশ্চৈতাদ্যা সাংলংকৃতিষাং”

আচার্য দণ্ডী/কাব্যাদর্শ/

স্বভাবোক্তি বা জাতি হচ্ছে আদ্য অলংকার। স্বভাবোক্তিতে—“স্বভাবোক্তি দুরূহা”
সক্সিয়া রূপবর্ণনম্” অর্থাৎ স্বভাবোক্তি অলংকার সৃষ্টি করতে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির
প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

“আমার এ গান ছেড়েছে তার

সকল অলংকার।

তোমার কাছে রাখেনি তার

সাজের অহংকার।

অলংকার যে মাঝে পড়ে

মিলনেতে আড়াল করে

তোমার কথা ঢাকে না যে তার

মুখের ঝংকার।”

কৃষ্ণ মিলনের জন্য রাধা তাঁর দেহে কোনো অভরণ রাখেন নি—

“চির চন্দন উরে হার ন দেলা”

তাই স্বাভাবিক সৌন্দর্যই হচ্ছে আসল সৌন্দর্য—কি কাব্যে কি মানবদেহে।

মহাকবি কালিদাস “কুমার সম্ভব” কাব্যে অকাল বসন্তের যে বর্ণনা দিয়েছেন,
তা শব্দে অনবদ্য নয়, অনুপমও বটে—

“মধু দ্বিরেফং কুসুমৈক পাঠে

পাপো প্রিয়াং স্বামনু বর্তমানঃ

শৃঙ্গেন চ স্পর্শ নিমীলিতাক্ষীং

মৃগীমকন্ডুরত কৃষ্ণসারঃ”

৩/৩৬

(একটি ফুলকে পানপাত্র স্থির করে ভ্রমর-বধূ তা থেকে মধু পান করছিল, প্রিয়ার
অনুবর্তন করে ভ্রমরও মধু পান করল সেই কুসুম পেয়ালা থেকে। দয়িতের স্পর্শ-
সুখে হরিণবধূর চোখ নিমীলিত হয়ে আসছে, আর হরিণ তাকে আদর করছে—তার
গায়ে সিং বুলিয়ে দিয়ে) অথচ এ একেবারে নিরলংকৃত বাণী। রবীন্দ্রনাথ ঐ শ্লোকটির
অনুবাদ করেছেন—

“একই কুসুমপায়ে ভ্রমর প্রিয়ার

পীত অবশেষে মধু করিল গো পান

স্পর্শ নিমীলিত চক্ষু মৃগীর শরীরে

কৃষ্ণসার শৃঙ্গ দিয়া করিল আদর”

রবীন্দ্রনাথ/“রূপান্তর”

“অধোপভুক্তেন বিসেন জায়াং সম্ভাবয়ামাস বধাদ্ভনামা” ॥

“কুমার সম্ভব” ১০৭/৩

“আধেক মৃগাল খেয়ে সুখে চক্ৰবাক

আধেক তুলিয়া দিল প্রিয়ার মুখেতে ।”

“রূপান্তর” / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / ৪৯

“নীল নভ ঘন আষাঢ় গগনে তিল ঠাই আর নাহিরে

ওগো তোরা যাস্নে ঘরের বাহিরে ।”

অনুপ্রাসের আমেজ থাকলেও অলংকারের বৈচিত্র্য নেই।

তবে একথা স্বীকার করতে হবে যে নিরলংকৃত কোন কাব্য নেই। এবং যে কোনো প্রথম শ্রেণীর কাব্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে—শতকরা পঁচানব্বইটি শ্লোকই অলংকৃত; নিরলংকৃত শ্লোকের ভাগ হচ্ছে মাত্র পাঁচটি। সুতরাং অলংকারের প্রয়োজনীয়তাকে কোনো মতেই অস্বীকার করা চলে না। কারণ কবিকৃতি সংগে অলংকার এক অচ্ছেদ্যবন্ধনে আবদ্ধ। রসাবিষ্ট কবিচিত্ত স্বগত ভাবের প্রকাশের দিকেই তন্ময়ীভূত হয়ে থাকে, শব্দ এবং অর্থ আপনা-আপনি উৎসারিত হয়ে আসে—বিচিত্র বক্রোক্তির আকারে, বিভিন্ন অলংকারের রূপ ধরে। সুতরাং অলংকারকে “আগন্তুক ধর্ম” বলা চলে না। অলংকার শব্দার্থের অন্তরঙ্গ বিলাস। তাই অলংকার “হবে ‘অপৃথকগুণ-নির্বর্তা’। ধন্যালোকের ২/১৭ বৃত্তিতে বলা হয়েছে—“ন তেবাং বহিরঙ্গং রসাভিব্য-ক্টো। (রসাভিব্যক্তি ব্যাপারে অলংকারগুলো কাব্যের বহিরঙ্গ হয় না। ফ্রোচে অনুরূপ কথা বলেছেন—“The intuition and expression together of a painter are pictorial; Those of a poet are verbal. But be it Pictorial or verbal, or musical, or whatever else it be called to no intuition can expression be wanting because it is a separable part of intuition”

Æsthetic. Ch.—1P 13-14

অলংকারের যদি সূষ্ঠ প্রয়োগ হয় তবে কাব্য উজ্জ্বল হয়ে উঠবেই উঠবে। রবীন্দ্রনাথ অলংকারকে বলেছেন “ছবি”—“কথার দ্বারা যাহা বলা চলে না, ছবির দ্বারা তাহা বলিতে হয়।……উপমা-রূপকের দ্বারা ভাবগুলি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে চায়। …চিত্র এবং সঙ্গীত ভাবে গতি দান করে। চিত্র দেহ এবং সঙ্গীত প্রাণ……” ‘দেখিবারে আঁখি-পাখি ধায়’ এই এক কথায় বলরামদাস কী না বলিয়াছেন? ব্যাকুল দৃষ্টির ব্যাকুলতা কেবলমাত্র বর্ণনায় কেমন করিয়া ব্যক্ত হইবে? দৃষ্টি পাখির মতো উড়িয়া

ছুটিয়াছে, এই ছবিটুকু প্রকাশ করিবার বহুতর ব্যাকুলতা মূহুৰ্ত্তে শাস্তি লাভ করিয়াছে ।”

সাহিত্যের তাৎপর্য/সাহিত্য।

অলংকারকে দুটো ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে—১) শব্দালংকার ২) অর্থালংকার।

শব্দালংকার

শব্দালংকার—ধ্বনি অলংকার। এ ধ্বনি হচ্ছে—বর্ণধ্বনি, পদধ্বনি, কোথাওবা বাক্যধ্বনি। বর্ণধ্বনি—অনুপ্রাসে, পদধ্বনি যমকে, বক্রোক্তি, শ্লেষ এবং পদনরুত্ত-বদাভাসে, বাক্যধ্বনি—সর্বযমকে।

শব্দালংকার : শব্দ প্রয়োগের দ্বারা যে ধ্বনি মাধুর্যের সৃষ্টি করে—তাকে শব্দালংকার বলা হয়। যে অলংকার বিবিধ বস্তু বা ভাবের বৈচিত্র্য সম্পাদিত করে পাঠক-পাঠিকাদের বা শ্রোতাদের বুদ্ধি ও কল্পনাকে উদ্দীপিত করে অর্থের দ্যোতনা করে তাকে অর্থলংকার বলা হয়।

শব্দালংকার এবং অর্থলংকারের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে—শব্দালংকারে শব্দের পরিবর্তন করা চলে না। কারণ শব্দের পরিবর্তন করলে অলংকার আর থাকবে না; কিন্তু অর্থলংকারে শব্দের পরিবর্তন করে সমার্থবাচক শব্দ যোজনা করলেও অলংকার থাকবে—যেমন—“নয়নে তোমার চপল দৃষ্টি চকিতহরিনী সম”—পূর্ণোপমা হয়েছে। ঐ পঙ্ক্তিকে যদি এ ভাবে লেখা হয়—“আঁখিতে তোমার চপল চাহনি প্রস্তু-মৃগী-সম”।

সমার্থকতার ভিত্তিতে শব্দ পরিবর্তন করা সত্ত্বেও পূর্ণোপমা ঠিকই রয়ে গেছে।

“ভারত ভারত খ্যাত আপনার গুণে”

আদ্যযমক। আদিত্যে একই শব্দ (ভারত) পাশাপাশি দু'বার ধ্বনিত হয়েছে—দুই পৃথক অর্থে—প্রথম ভারত = কবি ভারতচন্দ্র; দ্বিতীয় ‘ভারত’ = দেশ ভারত বর্ষ। কিন্তু যদি বলা হয় ভারত বাংলা খ্যাত—তবে অলংকার আর হবে না।

শব্দালংকার

শব্দালংকারগুলো হচ্ছে—অনুপ্রাস, যমক, বক্রোক্তি (শব্দ) শ্লেষ (শব্দ) এবং পদনরুত্তবদাভাস।

অনুপ্রাস

বর্ণ ধ্বনির অলংকার। একই বর্ণ বর্ণগুচ্ছ যুক্তভাবেই হোক আর বিষম ভাবেই হোক একাধিকবার ধ্বনিত হলে অনুপ্রাস হবে। বর্ণ বলতে ব্যঞ্জনবর্ণকে ধরা হয় স্বরবর্ণ নয়; স্বরবর্ণে অনুপ্রাস হবে না; যেমন—

“যেদিন হিমাদ্রি শৃঙ্গে নামি আসে আসন্ন আষাঢ়”

ভাষা ও ছন্দ/রবীন্দ্রনাথ

এখানে ‘আ’ ধ্বনি কয়েকবার ধ্বনিত হয়েছে, কিন্তু একে অনুপ্রাস বলা যাবে না।
কিন্তু

“আলো মৃদঙ্গ মুরজ মুরলী মধুরা”

এখানে ‘ম’ একাধিকবার ধ্বনিত হয়ে অনুপ্রাসের সৃষ্টি করেছে।

অনুপ্রাস—পাঁচ রকম অন্যান্যপ্রাস, আদ্যানুপ্রাস, বৃত্ত্যানুপ্রাস, ছেকানুপ্রাস এবং শ্রুত্যানুপ্রাস।

আদিতে একই ব্যঞ্জনবর্ণ একাধিকবার ধ্বনিত হলে, অন্তে হলে অন্যান্যপ্রাস হবে—

গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা

কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা।

তবে সংস্কৃতে ‘ষ’, ‘শ’, ‘স’ পৃথক ভাবে উচ্চারিত হয়; (পৃথক বর্ণ ধরা হয়) কিন্তু বাংলায় আমরা ‘দন্ত-স’, ‘মৃধ্ব-স্য’, ‘তালব্য-শ’, বলে একই ভাবে উচ্চারণ করে একই বর্ণ (কানে) করে ফেলোছি ফলে এখানে অন্যান্যপ্রাস হবে।

শয়ন শিয়রে প্রদীপ নিভেছে সবে

জাগিয়া উঠেছি ভোরের কোকিল রবে।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্ককে পত্র লিখতে গিয়ে এক নোতুন ধরনের অনুপ্রাস সৃষ্টি করেছেন, সেখানে প্রয়োজনবোধে শব্দকে ভেঙে অন্যান্যপ্রাস করেছেন—

“শ্রাবণে ডেপুটি **পনা**

এতো কভু নয় **সনা**

তগ প্রথা এষে **অনা**

সৃষ্টি অনাচার।

পত্র মানসী।

আবার তিনি বাংলা শব্দের সঙ্গে ইংরাজী শব্দ প্রয়োগ করে আর এক ধরনের অন্যান্যপ্রাস করেছেন—

“অন্ধকারে ওইরে **শোন**

ভারতমাতা করেন “**গ্লোন**”

এ হেন কালে ভীষ্ম **দ্রোণ**

গেলেন কোন্‌খানে।

বৃত্তানুপ্রাস : অনুপ্রাস মাত্রই বৃত্তানুপ্রাস । কারণ একই ব্যঞ্জনধ্বনি আবৃত্তি (repetition) হয়ে থাকে । “বৃত্তি” শব্দটি অনুপ্রাসের সঙ্গে যোগ করেন অষ্টম শতাব্দীর অলংকারিক উদ্ভট । তিনি বৃত্তি বলতে বুঝেছেন—বলার ভঙ্গি । বৃত্তি দ্বিবিধ—পদরুদ্রা, উপনাগরিকা এবং গ্র্যামা । ‘পদরুদ্রা’তে শ, স এর প্রাধান্য—
নিদ্রিতা প্রেয়সী

“লুপ্তিত শিখিল বাহু, পড়িয়াছে খসি

গ্রন্থি শরমের, মৃদু সোহাগ চুম্বনে

সর্চকিতে জাগি উঠি গাঢ় আলিঙ্গনে

লতাইবে বক্ষে মোর ।”

রবীন্দ্রনাথ/স্বর্গ হইতে বিদায়/চিঠা/

গ্রাম্যা-তে তরল ‘ল’ ধ্বনির প্রাধান্য—

“ললিত লবঙ্গলতা পরিশীলন কোমর মলয় সমীরে”

“মৃগ ললিত গীতে অশ্রুগলিত”

“ললিতাধরে মিলিত হাস”

জয়দেব/গীতগোবিন্দ ।

নিভর্য়/মহুয়া/রবীন্দ্রনাথ ।

পদকর্তা জগদানন্দ ।

“উপনাগরিক”তে অনুনাসিক মধুর ব্যঞ্জন ধ্বনির আবৃত্তি হয়—

“করকঙ্কণ পণ ফনীমুখ বন্ধন”

“কিকিৎসী করকংকন মৃদু ঝংকৃত মনোহারী”

“কেন বাজাও কাঁকণ কন কন কত ছল ভরে”

গোবিন্দদাস ।

জগদানন্দ ।

রবীন্দ্রনাথ ।

বৃত্তানুপ্রাস : এর চারটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে—

ক) একটি মাত্র ব্যঞ্জনবর্ণ দু’বা ধ্বনিত হবে—

“চলইতে চাহি চরণ নাহি ধাবয়ে”

মোতিম হার

বারশত টুটয়ে

গাঁথিয়া পদন অনুপাম ।”

জ্ঞানদান ।

জ্ঞানদাস ।

(এখানে ‘হ’ ও ‘র’ দু’বার ধ্বনিত হয়েছে)

খ) একটি ব্যঞ্জন বর্ণ বহুবার ধ্বনিত হবে—

“বাঁশরি বাজাতে চাহি, বাঁশরি বাজি কই”

‘ভাবিলা ভবেশ ভাবিনী কিভাবে আজিকে ভেটিব ভবেশে’

রবীন্দ্রনাথ ।

মধুসূদন/মেঘনাদ বধ ।

গ) ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরপানুসারে মাত্র দু'বার ধ্বনিত হবে—

“কবরী দিল করবীমালে ঢাকি।”

রবীন্দ্রনাথ।

‘ধরী’, ‘রবী’ স্বরপানুসারে ধ্বনিত হয়েছে।

ঘ) ব্যঞ্জনগুচ্ছ যুক্ত বা অযুক্তভাবে ক্রমানুসারে বহুবার ধ্বনিত হবে—

“এত ছলনা কেন বলনা

গোপললনা হ’ল সার।”

নীলকণ্ঠ পদাবলী।

“কান্ত পাহন কাম দারুণ সঘন খরশর হস্তিয়া।”

বিদ্যাপতি।

“মন্দ মন্দ হাসনানন্দ নন্দন সুখকারী।”

জগদানন্দ।

এখানে ‘লনা’, ‘ন্ত’ এবং ‘ন্দ’ বহুবার ক্রমানুসারে ধ্বনিত হয়েছে।

ছেকানুপ্রাস : এর তিনটি রূপ রয়েছে—১) যদ্ব্যঞ্জন দিয়ে এই অনুপ্রাস হয়।

২) দু’টো বা তার বেশি ব্যঞ্জনবর্ণ যুক্ত বা বিষয়ক থেকে ক্রমানুসারে মাত্র দু’বার ধ্বনিত হবে। ৩) বৃত্তানুপ্রাসেও ব্যঞ্জনগুচ্ছের দু’বার ধ্বনিত হবার লক্ষণ রয়েছে, কিন্তু সেখানে ধ্বনিত হয় অযুক্তভাবে এবং **স্বরপানুসারে**, কিন্তু ছেকানুপ্রাসে দু’বার ধ্বনিত হবে যুক্ত বা অযুক্তভাবে এবং **ক্রমানুসারে**।

ক) ১) “লংকার পঙ্কজ রবি গেলা অন্তাচলে।”

মধুসূদন।

২) “কুঁড়ি ভিতর কাঁদছে গন্ধ অন্ধ হয়ে।”

রবীন্দ্রনাথ।

৩) “করুণা কিরণে বিকচ নয়ান।”

রবীন্দ্রনাথ।

৪) “রিনিঝিনি রদনুঝনু সোনার নুপুর।”

রবীন্দ্রনাথ।

(প্রথম দু’টোতে যুক্তব্যঞ্জন এবং শেষ দু’টোতে অযুক্ত ব্যঞ্জনগুচ্ছ দু’বার করে ধ্বনিত হয়েছে।

শ্রুত্যানুপ্রাস : বাগযন্ত্রের একই স্থান থেকে উচ্চারিত শ্রুতিগ্রাহ্য-সাদৃশ্যময় ব্যঞ্জন ধ্বনি দিয়ে যে অনুপ্রাসের সৃষ্টি হয় তাকে শ্রুত্যানুপ্রাস বলে। অনুপ্রাসে একই ব্যঞ্জন বর্ণ হবে, কিন্তু শ্রুত্যানুপ্রাসে হবে পৃথক ব্যঞ্জনবর্ণ। অথচ উচ্চারণের সময় পৃথক বর্ণ ধ্বনি সাম্যে কানের পর্দা (Glide) কে ফাঁকী দিয়ে অনুপ্রাসের সৃষ্টি করে থাকে—

ক ও খ— পরপারে দেখি আঁকা তরুছায়ামসীমাখা

রবীন্দ্রনাথ।

হৃদয়ে চাঁদিমা আঁকা মধুর সুবাস মাখা।

ঐ

মেহ যেন নাম ডেকে কাছে এসে যায় দেখে।

ঐ

- গ ও ঘ— খরবারু বয় বেগে চারিদিক ছায় মেঘে রবীন্দ্রনাথ ।
 বাতাস বহিছে বেগে বিজরু চমকিছে মেঘে ।
- চ ও ছ— আমি ত চাহিনি কিছু শূদ্ধ বনের আড়ালে দাঁড়িয়েছিলাম
 নয়ন করিয়া নিচু । রবীন্দ্রনাথ ।
 যে প্রত্যুষে মধু মাছি বাহিরায় মধু যাচি । ঐ
- জ ও ঝ— এ গান বাঁচিয়া থাকে যেন তোর মাঝে
 আঁখি তারা হয়ে তোর আঁখিতে বিরাজে । ঐ
 “তোমার পিরীতে স্নেহ-সায়রের মাঝ
 তাহাতে ডুবিল মোর কুল-শীল-লাজ ।” ষদ্রনাথ ।
- ট ও ঠ— পাতার কোলে বাতাস লুটে
 ডাইনে তব প্রভাব উঠে । রবীন্দ্রনাথ ।
 তোমার বাসনাখানি আঁটিয়া মূঠি
 চাহেনা আঁকিড়িতে কালের ঝড়ি । ঐ
- ড ও ঢ— “ছুটি লয়ে কোন মতে পোটমান্টো তুলি রথে ।” ঐ
 “সে যে বৃষভানুসূতা মরমে পাইয়া বেধা ।” চণ্ডীদাস ।
- দ ও ধ— সে চরণ-ধূলি পরিশিতে করি সাধ
 জ্ঞানদাস কহে যদি করে পরমাদ । জ্ঞানদাস ।
 মনে জাগিছেতে বহুতর সাধ
 তুমি সাধিনো নাকো বাদ । (অ)
- প ও ফ— “কেদারার পর চাপি ভাবি শূদ্ধ ফিলসার্ফি” রবীন্দ্রনাথ ।
 ব ও ভ— “কুলনাহি পাই তল পাব তো তবু
 হতাশ মনে রইব না কভু ।” ঐ
 প্রেম যদি ভেঙে যায় কভু
 স্মৃতিটুকু রবে মনে তবু । (অচ)

দ ও ধ— পৌখলি রজনী পবন বহ মন্দ

চৌদিশে হিম হিমকর করু বন্ধ ।

গোবিন্দদাস ।

৭ ও থ— ওই মায়া চিত্রবৎ তরুলতা ছায়া পথ ।

রবীন্দ্রনাথ ।

শব্দ শ্লেষ

কবি যখন একই শব্দ বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করেন, তখন সেই অলংকারকে শ্লেষ অলংকার বলা হয় । শব্দ শ্লেষ দু'ধরনের— ১) অভঙ্গ ২) সভঙ্গ ।

যখন শব্দকে না ভেঙে শ্লেষ অলংকার করা হয় তখন তাকে অভঙ্গ শ্লেষ বলা হয় । এবং যখন শব্দকে ভেঙে অর্থের সৃষ্টি করে শ্লেষ অলংকার করা হয় তখন তাকে সভঙ্গ শ্লেষ বলা হয় ।

অভঙ্গ শ্লেষ :

“কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর

যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর ।”

ঈশ্বর=ভগবান্ ; ঈশ্বর=কবি নিজে অর্থাৎ কবির নাম ঈশ্বর । গুপ্ত=লুকান (অদৃশ্য) ; গুপ্ত=পদবী (এখানে কবির পদবী বা উপাধী) । প্রভাকর=সূর্যের দীপ্তি বা আলো ; প্রভাকর=কবি ঈশ্বর গুপ্ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত সংবাদপত্র ।

“দেখ নাকি হয়, বেলা চলে যায়, সারা হয়ে এল দিন ।

বাজে পূরবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিণীর বীণ ॥” পূরবী/রবীন্দ্রনাথ ।

পূরবী=সন্ধ্যা, গোপালীর রাগিণী ; পূরবী=রবীন্দ্রনাথের কাব্য । রবি=সূর্য্য ; রবি=রবীন্দ্রনাথ । ১) সন্ধ্যা হয়ে এসেছে (সূর্য অস্তমিত), ওস্তাদজী এখন পূরবী রাগিণীতে গান গাইবেন । ২) কবির বয়স হয়েছে (হয়ত বিদায়ের দিন ঘনিষে এসেছে) তাই ভাবছেন বিদায় নেবার আগে শেষ কাব্য রচনা করলেন পূরবী নামে । (“অর্থ শ্লেষ” নামে একটি অর্থালংকার আছে । ‘শব্দ শ্লেষের সঙ্গে ‘অর্থ শ্লেষের পাথক্য হচ্ছে— শব্দ শ্লেষে শব্দ পরিবর্তন করলে আর অলংকার থাকবে না, কিন্তু অর্থ শ্লেষে থাকবে) ।

সভঙ্গ শ্লেষ :

“আমার দিনের শেষ ছায়াটুকু মিশাইল মূলতানে

গুঞ্জন তার রবে চিরদিন ।”

রোগশয্যা/রবীন্দ্রনাথ ।

মূলতান=রাগিণী বিশেষ । মূল+তান=গোড়ার তান, আসল (মূল) তান ।

“অপরূপ রূপ কেশবে

দেখরে তোরা এমনধারা কালোরূপ কি আছে ভবে ।” দাসরথি রায় ।
কেশব=কৃষ্ণ ; কে+শবে=শবের ওপর কে ? অর্থাৎ কালী । শবরূপী মহাদেবের
বন্ধুর ওপর দাঁড়িয়ে আছেন তিনি । কৃষ্ণ/কালী দুই-ই কালো এবং দুইয়ের রূপই
অপরূপ ।

পুনরুক্তবদাভাস

এই অলংকারে মনে হবে লেখক একই অর্থে একাধিক শব্দ ব্যবহার
করেছেন, কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে লেখক একই অর্থবাচক শব্দ পাশা-
পাশি ব্যবহার করেন নি—ভিন্ন অর্থে সেই শব্দ ব্যবহার করেছেন—

“তন্দ্র দেহখানি ঘোরিয়াছে ড়রে শাড়ী”

রবীন্দ্রনাথ ।

তন্দ্র=সাধারণ অর্থ ‘দেহ’ । ‘দেহ’ অর্থও ঐ ‘দেহ’ বা শরীর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ;
কিন্তু ‘তন্দ্র’ শব্দটির আর একটি অর্থ হচ্ছে—তন্দ্রা, ছিপছিপে ।

“দ্বিষামা যামিনী একা বসে গান গাহি

হতাশ পথিক, সে যে আমি সেই আমি ।”

‘দ্বিষামা’ শব্দের একটি অর্থ রাত্রি । আবার দ্বি=তিন, যাম=প্রহর, এখানে রাত্রির
তৃতীয় প্রহর না হয়ে হয়েছে—“যামিনী” শব্দের বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত ‘তিনপ্রহর’
রাত্রি অর্থাৎ সমস্ত রাত্রি । ফলে একই অর্থে ‘দ্বিষামা’ ও ‘যামিনী’ ব্যবহৃত হয়নি ।

যমক

দুটি বা তার বেশি ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরধ্বনিসহ (বা একই শব্দ) নির্দিষ্ট ক্রমে
‘সার্থক’ বা ‘নিরর্থক’ ভাবে ব্যবহৃত হলে যমক অলংকার হয় ।

‘সার্থক’ বা ‘নিরর্থক’ বলার অর্থ হচ্ছে আবৃত্ত শব্দের ‘অর্থ’ থাকতে পারে
এবং অর্থ নাও থাকতে পারে ।

‘নির্দিষ্ট’ ক্রমের অর্থ হচ্ছে—‘রাধা’ শব্দটির পর ‘ধারা’ বসিয়ে দিলে যমক
হবে না ।

(ধন্যলোকে যমককে কুর্নিয়ম অলংকার করে কাব্যে প্রয়োগ করতে নিষেধ করেছেন, এ
স্বতঃস্ফূর্ত রচনা নয়—পৃথগ্‌বিন্মিত্য)

যমক চার প্রকারের—১) আদ্য-মধ্য-অন্ত্য এবং সর্বভেদে যমক ।

১) ভারত ভারত খ্যাত আপনার গুণে ।

ভারত—কবি ভারত চন্দ্র ; ভারত—দেশ ভারতবর্ষ ।

- ২) রজনী রজনী যাপিছে একাকিনী ।
 রজনী=একটি মেয়ে ; রজনী=রাত্রি (অ)
 ১), ২) আদ্য এবং সার্থক শ্লোক ।

৩) “পাইয়া চরণ তরি তরি ভবে আশা”

তরি—নৌকা ; তরি—তড়াইয়া যাওয়া ।

৩) মধ্য এবং সার্থক শ্লোক ।

৪) আটপানে আধসের কিনিয়াছি চিনি

অন্যলোকে ভূয়া দেয় ভাগ্যে আমি চিনি

চিনি=(Sugar) ; চিনি=চেনা (recognise)

অন্ত্য এবং সার্থক শ্লোক ।

৫) কান্তার আমোদপূর্ণ কান্ত সহকারে

কান্তার আমোদপূর্ণ কান্ত সহকারে ।

কান্তার=বনভূমি এবং দয়িতা ; আমোদ=সৌরভ ও আনন্দ ; কান্ত=বসন্তকাল, প্রিয়তম, সহকারে=সমাগমে, সঙ্গে ।

প্রথম পঙ্ক্তি—বনভূমি বসন্তের আগমনে সৌরভ পূর্ণ হয়েছে । দ্বিতীয় পঙ্ক্তি—প্রিয়তমা প্রিয়তমের আগমনে বা সঙ্গলাভে আনন্দিত ।

সার্থক শ্লোক :

১) ‘অর্থ চাই রাজকোষে আছে ভূরি ভূমি

রাজ স্বপ্নে অর্থ নাই যত মাথা খুঁড়ি ।”

রবীন্দ্রনাথ ।

২) জীবে দয়া তব পরম ধর্ম ‘জীবে’ দয়া তব কই ।

কালিদাস রায় (কবিশেখর)

(রূপ গোস্বামীর প্রতি সনাতন গোস্বামীর উক্তি)

৩) “ভোজন কর কৃষ্ণজীরে, ভজন কর কৃষ্ণজীরে ।”

দাশরথি রায় ।

প্রথম—কৃষ্ণজীরে = কালোজীরে ; দ্বিতীয়—কৃষ্ণজীরে=ভগবান কৃষ্ণকে ।

একটি সার্থক অপরিণীত নিরর্থক :

১) “যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল”

জ্ঞানদাস ।

২) করেছ ভ্রমণ মম যৌবন-বনে ।

রবীন্দ্রনাথ ।

৩) মলের বলমলে চরণ টলমল ।

বাঁকমচন্দ্র ।

(যমকের সঙ্গে ইংরাজী (Pronomasia) অলংকারের কিছুটা সাদৃশ্য আছে) ।

বক্রোক্তি

বক্তার অভিপ্রেত অর্থটিকে শ্রোতা গ্রহণ না করে যদি অন্য অর্থে গ্রহণ করে—
তাহলে বক্রোক্তি অলংকার হবে ।

বক্রোক্তি দু'ধরনের—১) কাকু বক্রোক্তি ২) শ্লেষ বক্রোক্তি ।

কাকু বক্রোক্তি : যে অলংকারটি বক্তার কণ্ঠস্বরের ভঙ্গীর ওপর নির্ভর করে
(কাকু = স্বরভঙ্গী) ।

১) কে ছেঁড়ে পদ্যের পদ্য ?

মধুসূদন ।

(কেউনা)

২) নখ ছেদনে কে লয় কুঠার ?

(কেউনা)

৩) 'বামন হইয়া

কে চাহে ধরিতে চাঁদে ?'

মধুসূদন ।

৪) কে পারে ফিরাতে প্রবাহে ?

ঐ

শ্লেষ বক্রোক্তি : একই শব্দ নানা অর্থে গৃহীত হলে শ্লেষ বক্রোক্তি অলংকার হয় ।
শব্দের অন্তর্গত বৈচিত্রের ওপর শ্লেষ বক্রোক্তি নির্ভর করে —

প্রশ্ন—দ্বিজ হয়ে কেন কর বারুণী সেবন

উত্তর—রবির ভয়েতে শশী করে পলায়ন ।

প্রশ্নকারী—দ্বিজ = ব্রাহ্মণ, বারুণী = মদ্য, দ্বিজ = চন্দ্র, বারুণী = পশ্চিম দিক ।

প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্য—বামন হয়ে মদ খাচ্ছ কেন ?

উত্তর—সূর্য উঠছে কিনা, তাই চাঁদ পশ্চিমে ডুবছে ।

অর্থালংকার

যে-অলংকার একান্তভাবে অর্থের ওপর নির্ভর করে সৃষ্ট তাকে অর্থালংকার
বলা হয় ।

অর্থালংকারকে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে—১) সাদৃশ্যমূলক

২) বিরোধমূলক ৩) শৃঙ্খলা ৪) ন্যায় ৫) গুণার্থপ্রতীতি ।

সাদৃশ্য : উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, অপহৃতি, নিশ্চয়, সন্দেহ, ভ্রান্তিমান, ব্যতিরেক, প্রতীপ, সমাসোক্তি, অতিশয়োক্তি, উল্লেখ, দীপক, তুল্যযোগিতা, প্রতিবস্তুপমা, বিম্ব-প্রতিবিম্বভাবের উপমা, বস্তু-প্রতিবস্তুভাবের উপমা, দৃষ্টান্ত, নিদর্শনা, স্মরণ, সামান্য, সহোক্তি, অর্থ শ্লেষ ।

বিরোধ : বিরোধভাস, বিভাবনা, বিশেষোক্তি, অসঙ্গতি, বিষম, অধিক, অনাকুল, ব্যাঘাত, অন্যান্য ।

শৃঙ্খলা : কারণমালা, একাবলী, সার, মালাদীপক ।

ন্যায় : অর্থাপত্তি, কাব্যালিঙ্গ, অনুমান, পর্যায়, পরিবৃদ্ধি, সমুচ্চয়, পরিসংখ্যা, উত্তর, সমাধি, তদগুণ ।

গুণার্থ-প্রতীতি : অর্থান্তরন্যাস, অপ্রস্তুতপ্রশংসা, আক্ষেপ, ব্যজস্তুতি, পর্যায়োক্ত, পরিকর, সূক্ষ্ম, ব্যাজোক্তি, স্বভাবোক্তি, ভাবিক, উদাত্ত ।

সাদৃশ্যমূলক অলংকার

সাদৃশ্য মূলক অলংকারকে ‘উপমা’ অলংকার বলা হয় । কারণ এই শ্রেণীর অলংকারগুলোর মধ্যে ‘উপমা’ বস্তুটি নানা ভাবে ব্যঞ্জিত হয়ে থাকে । তাই প্রাচীন কালে বলা হ’ত উপমা “কালিদাস্য” । আধুনিক যুগে বলা হয়ে থাকে “উপমা রবীন্দ্রস্য” অর্থাৎ কালিদাস/রবীন্দ্রনাথ সাদৃশ্যমূলক অলংকার সৃষ্টিতে “সিন্ধি” লাভ করেছেন এবং এ-ক্ষেত্রে তাঁরা তুলনারহিত । সাদৃশ্যমূলক অলংকারে চারটি বস্তু থাকে :—

যে বস্তুর সঙ্গে বা যে বস্তুর দ্বারা তুলনা করা হয় তাহা—উপমান ।

(“যেন উপমীয়তে তদুপমানম্ যশ্চ উপমীয়তে স উপমেয়ঃ”) ।

ক) যে-বস্তুটিকে তুলনা করা হয়—উপমান ।

খ) যে বস্তুটিকে তুলনার বিষয়ীভূত করা হয় তা উপমেয় ।

গ) উপমান ও উপমেয়ের একটি সাধারণ ধর্ম থাকবে এবং উভয়ের সেই ধর্মে সাদৃশ্য থাকবে ।

ঘ) তুলনা বাচক শব্দ থাকবে—সম, নিভ, প্রতীম, যেমন, পারা প্রভৃতি ।

ঙ) তবে স্বরণ রাখতে হবে যে এই তুলনা হবে বিজাতীয় বস্তুর সঙ্গে ; এক বা

সমজাতীয় (Similar) বস্তুর সঙ্গে হবে না, বস্তু দুটো হবে Disimilar।
মানুষের চোখের সঙ্গে আর একটি মানুষের চোখের তুলনা করা যাবে না কারণ
এরা Similar বস্তু; মানুষের চোখের সঙ্গে হরিণের চোখের তুলনা হবে;
মানুষের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে কোকিলের কণ্ঠস্বরের তুলনা করা চলবে।

উপমেয়কে আবার 'প্রকৃত' ও 'প্রস্তুত' বলা হয় এবং উপমানকে 'অপ্রকৃত' এবং
'অপ্রস্তুত' বলা হয়।

“লোভন হয়েছে রেশম চিকন জুলে”

তুল—উপমেয় (প্রকৃত বা প্রস্তুত); রেশম—উপমান (অপ্রকৃত বা অপ্রস্তুত)

“রাধার মূখটি চাঁদের মত সুন্দর”

মুখ (রাধার) উপমেয়; চাঁদ—উপমান; মত—তুলনা বাচক শব্দ; উভয়ের সাধারণ
ধর্ম ‘সুন্দর’ (রাধার মুখও সুন্দর, চাঁদও সুন্দর)।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা স্মার্তব্য যে কথা বলার ভঙ্গী পরিবর্তনের সঙ্গে
সঙ্গেই অলংকারের পরিবর্তন হবে। অর্থাৎ বক্রোক্তি ফলেই অলংকারের পরিবর্তন
হবে। তাই বক্রোক্তিকে অলংকারের সারভূত আত্মা বলা অন্যায় হবে না। যেমন—

ক) রাধার মূখটি চাঁদের মত সুন্দর। (পূর্ণোপমা)

খ) রাধা চন্দ্র-মুখী। (রূপক)

গ) রাধা যেন চাঁদ। (বাচ্যপ্রেক্ষা)

ঘ) রাধার মূখটি চাঁদের মত। (সাধারণ ধর্মের উল্লেখ নেই—সদৃশ্যোপমা,

ঙ) রাধা, চাঁদ নয়। (নিশ্চয়)

চ) রাধা নয় চাঁদ। (অপহৃতি)

ছ) রাধার মূখটি চাঁদের চেয়ে সুন্দর। (ব্যতিরেক)

উপমা কালিদাসস্য

‘উপমা’ শব্দটির সাধারণ অর্থ (তুলনা) বাদেও আরও দুটো অর্থ রয়েছে।
সংকীর্ণ অর্থে উপমা হচ্ছে শব্দমাত্র ‘উপমা’ নামক অলংকার এবং ব্যাপকাথে হচ্ছে—
সাদৃশ্যমূলক অলংকারগুলো।

কালিদাস সাদৃশ্যমূলক অলংকার সৃজনে ‘সিন্ধি’ লাভ করেছেন। কালিদাসের
ছিল “অপূর্ববস্তু নির্মাণক্ষম প্রতিভা।” ষাগবেদে দেবরাজ ইন্দ্রের বন্দনা করে বলা
হয়েছে—

“ন হী নু অস্য প্রতিমানমন্তি

অন্তর্জাতেষু উত তে জানিহ্মাঃ।”

(অর্থাৎ—নাই নাই এর সমকক্ষ, তাঁদের মধ্যে যারা জন্মেছেন অথবা জন্মাবে)। কিন্তু

রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের ফলে ঐ স্বাধিক্যকে এখন আর সাধক-সত্য বলে গ্রহণ করা চলে না কারণ এখন বলা যেতে পারে—“উপমা রবীন্দ্রস্য”। দুই প্রান্তে দুই দিকপাল ; মধ্যে রয়েছেন বিদ্যাপতি ও মধুসূদন।

কালিদাসের সমস্ত রচনাগুলিকে বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে তিনি সর্বমোট ‘বারোশ’ উপমা ব্যবহার করেছেন। তার মধ্যে ‘কুমারসম্ভব’ কাব্যে ‘আড়াইশ’, শ্রেষ্ঠদূতে ‘পঞ্চাশ’। উপমা প্রয়োগের সময় উপমান উপস্থাপনায় তিনি পশু, পক্ষী, কীট-পতঙ্গ যেমন ব্যবহার করেছেন তেমনি বসন-ভূষণ, মেঘমেদুর-অম্বর, নীলনভ, নদনদী, জ্যোৎস্না রজনী এবং বিভিন্ন তরুলতার ব্যবহার করেছেন।

“যস্যাবরোধস্তনচন্দনানাং প্রক্ষালনাদ্ভাবিবিহারকালে
কালিন্দকন্যা মথুরাং গতাপি : গঙ্গোর্মিসংসক্তজলের ভাতি”

রঘুবংশম্ ৬/৪৮

(এই মহাপতির অন্তঃপূর নারীগণের জলবিহার সময়ে পয়োধরলিপ্ত চন্দনের প্রক্ষালন হেতু কালিন্দ নন্দিনী যমুনা মথুরাবাসিতা হয়েও যেন গঙ্গাতরঙ্গের সঙ্গে মিলিত হয়ে অপূর্ব শোভা ধারণ করেছে। এখানে উৎপ্রেক্ষা (বাচ্য) অলংকার হয়েছে)

“তস্মাদ্ গচ্ছে-রনুখলং শৈলরাজাবতীনাং
জহোঃ কন্যাং সগর-তনয়-স্বর্গসোপান-পংক্তিম্
গৌরী-বস্ত্রা-ভ্রুকুটি-বচনাং যা বিহস্যৈর ফেনৈঃ
শম্ভোঃ কেশগ্রহণমকরদিদুল্লগ্নোর্মিহস্তা।”

পূর্ব মেঘ/৫১

(যেখান থেকে যেয়ো কনখলের দিকে। সেখানে হিমালয় থেকে নেমেছেন জহু-কন্যা—
(যেন) সগরতনয়দের স্বর্গগমনের সোপানশ্রেণী। কোনো ছলে তিনি যেন গৌরীর
মুখের ভ্রুকুটিভঙ্গ উপহাস করে চন্দ্রকরোজ্জ্বল তরঙ্গহস্তে শম্ভুর চুলের মূর্তি ধরেছেন)
উৎপ্রেক্ষা অলংকারের চরম নিদর্শন।

“তস্য স্থিত্য কথমপি পূরঃ কৌতুকাধান হেতো-
রন্তর্বাস্পিশির-মনুচরো রাজবাজস্য দধৌ
মেঘালোকে ভবতি স্নানোহপন্যাথাবৃন্তি চেতঃ
কণ্ঠা শ্রেষ প্রণয়িনি জনে কিং পুনর্দুর সংস্থ”

পূঃ মে/৩

যক্ষের অবস্থার মধ্য দিয়ে বিশ্ববাসী অবস্থার উল্লেখ করাতে “অর্থশূন্যাস” অলংকার হয়েছে।

“সন্তপ্তানং ত্বমসি শরণং তং পয়োদ প্রিয়ায়াঃ
সদেদংশং মে হর ধনপতি ক্রোধ বিশ্রোষিতস্য

পদঃ মে/৭

সমাসোক্তি অলংকার।

“তাণ্ডাবশ্যং দিবগ নাভং পরামেকপত্নী-
মব্যাপন্নাম বিহতগতিদ্রক্ষ্যসি ভ্রাতৃজারাম্।
আশবন্ধঃ কুসুম সদৃশং প্রায়োশহাঙ্গনানাং
সদ্যঃপতি প্রণয়ি হৃদয়ং বিপ্রয়োগে রুণাক্ষি”

পদঃ মে/১০

স্বভাবোক্তি।

তুঃ “অজ্ঞং গওন্তি অজ্ঞং গওন্তি অজ্ঞং গওন্তি গণরীএ।
পড়মে বিবঅ দিঅহেদে কুছো রেহাহিং চিওনিও”

গাথা সপ্তশতি

উপমা রবীন্দ্রস্য

কালিদাসের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথকে বসিয়ে সাদৃশ্যমূলক অলংকার রচনার উভয় কবিই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নানাদীর্ঘ আলোচনা করা হ’ল।

কালিদাসের মেঘদূতের চরণ সংখ্যা চারশ আটবাড়ি। রবীন্দ্রনাথের “মানস সুন্দরী” কবিতাটির চরণ সংখ্যা তিনশ আটত্রিশ, এবং ‘উপমা’ সংখ্যা চুরাশী। রবীন্দ্রনাথের ‘বলাকা’ গ্রন্থের “সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি” কবিতাটির চরণ সংখ্যা পয়ষাট এবং ‘উপমা’ সংখ্যা চব্বিশ। “মানস সুন্দরী” এবং “সন্ধ্যারাগে-ঝিলিমিলি” কবিতা দুটো থেকে দেখান হচ্ছে “উপমা রবীন্দ্রস্য” উক্তির যথার্থ—

“সন্ধ্যারাগে-ঝিলিমিলি ঝিলিমের স্রোতখানি বাঁকা

আঁধারে মলিন হল, যেন খাপে ঢাকা

বাঁকা তলোয়ার”

এখানে উপমেয়—‘স্রোত’; উপমান—‘তলোয়ার’; সমান ধর্ম—‘বাঁকা’ (উভয় ক্ষেত্রে), এখানে প্রবল সাদৃশ্যের ফলে উপমেয়কে উপমান বলে সন্দেহ করা হয়েছে, সুতরাং এ হচ্ছে বাচ্যেৎপ্রেক্ষা অলংকার। তবে একে পদার্থোপমাও বলা যেতে পারে—‘যেনকে’

as if না ধরে “যেমন” অর্থে প্রয়োগ করলে ‘তুলনা’ বাচক শব্দ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। উপরন্তু ঐ পঙক্তিগুলোতে উপমান, উপমেয়, তুলনাবাচক শব্দ এবং সাধারণ ধর্ম রয়েছে।

“এল তার ভেসে-আসা ‘তারা-ফুল’ নিয়ে...”

“তারাফুল”—রূপক স্নতরাং এটি নিরঙ্গ রূপক অলংকার।

“মনে হয়, সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে

বলিতে না পারে স্পষ্ট করি

অব্যক্ত ধর্মের পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি”

এখানে “বাচ্যাৎপ্রেক্ষা” এবং “সমাসোক্তি” অলংকার হয়েছে।

“হে হংস বলাকা

ঝঞ্জামদরসে-মত্ত তোমাদের পাখা...”

Personification (সম্ভোধন—হে হংস বলাকা) “সমাসোক্তি” অলংকার হয়েছে।

“মনে হল এ পাখার বাণী

দিল আনি

শুদ্ধ পদ্যকের তরে

পদ্যকিত নিশ্বনের অন্তরে অন্তরে

বেগের আবেগ।”

এখানে “বাচ্যাৎপ্রেক্ষা” ও “প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা অলংকার হয়েছে।

“তৃণদল

মাটির আকাশপরে ঝাপটিছে ডানা

মাটির আঁধার-নীচে কে জানে ঠিকানা,

মেলিতেছে অঁকুরের পাখা

লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।”

এখানে “সমাসোক্তি” অলংকার হয়েছে।

এবারে “মানসসুন্দরী” থেকে কিছু অলংকারের নিদর্শন তুলে ধরা হচ্ছে—

“ — এস তুমি প্রিয়ে,

আজন্ম-সাধন-ধন সুন্দরী আমার

কবিতা, কল্পনা-সত্য।”

(সমাসোক্তি ও রূপক)।

“নবক্ষুট পদ্মপসম

হেলায়ে বঙ্কিম গ্রীব বস্ত্র নিরুপম

মুখখানি তুলে ধোরো”

(উপমা)।

“হেরিব অদরে পদ্মা, উচ্চতটতলে

শ্রান্ত রূপসীর মতো বিস্তীর্ণ অঞ্চলে

প্রসারিয়া তনুখানি, সায়াহে-আলোকে

শূন্যে আছে।”

(সমাসোক্তি)।

“যামিনী শয়ন তার

দেয় বিছাইয়া, একখানি অঙ্ককার

অনন্ত ভুবনে।”

(সমাসোক্তি)

“দেখায়ে গোপন পথ দিতে মুক্ত করি

পাঠগালা কারা হতে।”

(রূপক)।

“ছিলে খেলার সঙ্গিনী,

এখন হয়েছে মোর মমের গেহিনী,

জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।”

(উল্লেখ)।

“সৌন্দর্য-পাথারে

যে বেদনা বায়ুভয়ে ছুটে মন-তরী।”

(রূপক)।

উপমা

একইবাক্যে স্বভাবধর্ম বিজাতীয় দুটো বস্তুর বিসদৃশ্য কোনো ধর্মের উল্লেখ না করে যদি বিশেষ গুণে, বা অবস্থায় অথবা ক্রিয়ায় বস্তু দুটোর সাদৃশ্য দেখানো হয় তাহলে তাকে উপমা অলংকার বলা হয়।

উপমাকে সাধারণ ভাবে সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে—পূর্ণোপমা, লক্ষণোপমা, বস্তুপ্রতিবস্তুভাবের উপমা, বিস্বপ্রতিবিস্বভাবের উপমা, মালোপমা, স্মরণোপমা, প্রতিবস্তুপমা।

পূর্ণোপমা : যে-উপমা অলংকারে উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম এবং তুলনাবাচক শব্দ অর্থাৎ চারটি অঙ্গ থাকে—তাকে পূর্ণোপমা বলা হয়—

১) “আনিয়াছি ছুরি তীক্ষ্ণদীপ্ত প্রভাত রশ্মিসম।”

রবীন্দ্রনাথ।

উপমেয়=ছদ্ম ; উপমান=প্রভাত রশ্মি ; সাধারণ ধর্ম=তীক্ষ্ণদীপ্ত ; তুলনা বাচক শব্দ=সম ।

২) “সিন্দুর বিন্দু শোভিল ললাটে

গোধূলি-ললাটে, আহা ! তারারত্ন যথা ।”

মধুসূদন ।

উপমেয়—সিন্দুর বিন্দু ; উপমান—তারার ; সাধারণ ধর্ম—শোভিল (ললাটে) ; তুলনাবাচক শব্দ—যথা (যেমন)

৩) পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি

আপন গণ্ডে মম

কন্তুরি মৃগসম ।

৪) “বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস পরে

যেমতি যোগিনী পারা”

চণ্ডীচাস ।

৫) “এ যে তোমার তরবারি

জ্বলে ওঠে আগুন যেন, বজ্রহেন ভারি ।”

রবীন্দ্রনাথ ।

৬) “চঞ্চল আলো আশার মতন

কাঁপিছে জলে ।”

রবীন্দ্রনাথ ।

লুপ্তোপমা

যে উপমা অলংকারে একমাত্র উপমেয় ছাড়া অন্য তিনটি অঙ্গে—একটা, দুটো এমনকি তিনটিই লুপ্ত থাকে—তাকে লুপ্তোপমা অলংকার বলা হয় ।

ক) তুলনাবাচক শব্দ লুপ্ত :

১) কমলফুল-বিমল শেজখানি ।

রবীন্দ্রনাথ ।

২) রঞ্জিত মেঘের মাঝে তুষারধবল

তোমার প্রাসাদ সৌধ

খ) সাধারণ ধর্ম লুপ্ত :

১) শরদিব্দ নিভাননী প্রমীলা সুন্দরী

উপমেয়—আনন, উপমান—শরদিব্দ, তুলনাবাচক শব্দ—নিভ ।

২) আমি শিব পূজো করে শিবের মতন স্বামী পেয়েছিলাম—

গিরিশচন্দ্র ।

৩) “কন্টক গাড়ি কমলসম পদতল

মঞ্জীর চীরি হি ঝাঁপি”

গোবিন্দ দাস ।

গ) সাধারণ ধর্ম ও তুলনাবাচক শব্দ লুপ্ত :

১) “দুঃখফেন-শয়ন করি আলো

স্বপ্ন দেখে ঘুমায় রাজবালা”

রবীন্দ্রনাথ।

দুঃখফেন-শয়ন = দুঃখফেন নিভ শয়ন = দুঃখের ফেনার মতো নরম বিছানা—তুলনা-
বাচক (নিভ) শব্দ ও কোমল (নরম) (বিছানা) লুপ্ত।

২) “তিলেক না দেখি ও চাঁদবদন

মরমে মরিয়া থাকি।”

চণ্ডীচাম।

৩) নীরবিলা শশিমুখী

মধুসূদন।

ঘ) উপমান, সাধারণ ধর্ম এবং তুলনাবাচক শব্দ লুপ্ত :

১) তিড়িত-বরণী হরিণ-নয়নী

দেখিন্দু আঙিনা মাঝে।

মালোপমা

যেখানে উপমেয় একটি এবং উপমান একাধিক সেখানে মালোপমা হয়—

“মলিন বদনা দেবী, হাসরে যেমতি

খনির তিমির গর্ভে (না পাবে পশিতে

সৌরকর রাশি যথ) সূর্যকান্ত-মণি,

কিস্বা বিশ্ববধরা রমা অম্বরূশি তলে”

মধুসূদন।

উপমেয় = দেবী ; উপমান = সূর্যকান্তমণি এবং রমা।

বস্তু-প্রতিবস্তুভাবের উপমা : ১) একই সাধারণ ধর্ম উপমেয় এবং উপমানের
মধ্যে থাকবে, এবং বিভিন্ন ভাষায় তা প্রকাশিত হবে ১) যদি তাই হয় তবে সাধারণ
ধর্মের এই ভিন্নভাষারূপ দুটোকে বলা হয়—‘বস্তুপ্রতিবস্তু’, ১) এই অলংকারে
তুলনাবাচক শব্দ থাকবেই থাকবে।

“নিশকালে যথা

মৃদিল কমল দলে থাকে গুপ্তভাবে

সৌরভ এ প্রেম, বঁধু-আছিল হৃদয়ে

অন্তরিত।

(দুটো পৃথক বাক্য-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য)।

উপমেয়—প্রেম ; উপমান—সৌরভ ; সাধারণ ধর্ম—গুপ্তভাবে এবং অন্তরিত (দুটোর
অর্থ এক) ; তুলনাবাচক শব্দ—যথা।

মধুসূদন।

২)

একটি চুম্বন

ললাটে রাখিয়া যাও একান্ত নিৰ্জ্ঞান

সন্ধ্যা তারার মতো ।

রবীন্দ্রনাথ ।

৩)

দারুণ নখের ঘা হিয়াতে বিরাজে

রক্তোৎপল ভাসে হেন নীল সরোম্বাঝে ।

সাধারণ ধর্ম—বিরাজে এবং ভাসে (চণ্ডীদাস) । উপমেয়—ঘা ; উপমান—রক্তোৎপল ।

বিশ্বপ্রতিবিশ্বভাবের উপমা : এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—ক) উপমেয়ের ধর্ম এবং উপমানের ধর্ম পৃথক হবে । খ) কিন্তু বিশ্লেষণ করলে তাদের মধ্যে সূক্ষ্ম সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যাবে—এরই ফলে বিশ্বপ্রতিবিশ্বভাবাপন্ন হবে সাধারণ ধর্ম । গ) দুই বাক্যের অলংকার । ঘ) উপমেয় এক বাক্যে, উপমান আর এক বাক্যে থাকবে । ঙ) তুলনাবাচক শব্দ থাকবে—

“কান্দুর পিরীতি

বলিতে বলিতে

পাঁজর ফাটিয়া উঠে ।

শঙ্খ বণিকের

করাত ষেমতি

আসিতে যাইতে কাটে”

উপমেয়—কান্দু পিরীতি ; উপমান—শঙ্খ বণিকের করাত । উপমেয়ের ধর্ম—“বলিতে বলিতে……উঠে” উপমানের ধর্ম—“আসিতে……কাটে, ধর্ম দুটো ভিন্ন । বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—দুটোই ‘বেদনাময়’ ; তুলনাবাচক শব্দ—ষেমতি ।

২) “দিনের শেষে শেষ আলোটি পড়েছে ওই পারে

জলের কিনারায়,

পথে চলতে বধু যেমন নয়ন রাঙা করে

বাপের ঘরে চায় ।”

রবীন্দ্রনাথ ।

উপমেয়—শেষ আলোটি ; উপমান—বধু ; এদের ধর্ম বিভিন্ন । আসন্ন বিচ্ছেদ দুটোর মধ্যে রয়েছে—সূর্য অস্তমিত—পশ্চিম আকাশ হোরির আবিরের মতো রাঙা, আবার বাপের বাড়ী ফেলে মেয়ে শ্বশুর বাড়ী যাচ্ছে—এই বিদায়ের ক্ষণে বধুটি চোখ রাঙা (অশ্রু বিসর্জনের জন্য) সুতরাং উভয়ক্ষেত্রে আসন্ন বিদায়ের জন্য বেদনার উদ্রেক করছে, তুলনাবাচক শব্দ—‘যেমন’ ।

৩) বরিষার কালে, সখি, প্লাবন-পাড়নে

কাতর প্রবাহ, তালে ; তীর অতিক্রমি,

বারি রাশি দহই পাশে, তেমতি যে মনঃ

দুঃখি, দুঃখের কথা কহে সে অপরে ।”

স্মরণোপমা

একটি বস্তু দেখে যদি সাদৃশ্যমূলক আর একটি বস্তুর কথা স্মৃতিপটে জেগে ওঠে এবং তা যদি চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করতে পারে তা’হলে স্মরণোপমা হবে। একে আবার “স্মরণ” অলংকারও বলা হয়ে থাকে। বস্তু দুটোর মধ্যে সাদৃশ্য থাকতে হবে, সাদৃশ্য না থাকলে স্মরণ করলেও স্মরণোপমা হবে। কারণ সেখানে তুলনা করা হল না—

“কাল জল ঢালিতে সই কালা পড়ে মনে

নিরবধি দেখি কালা শয়নে স্বপনে ।”

জলের (যমুনার) রং কালো এবং কৃষ্ণের দেহের বরণো কালো, এখানে কালো জলকে দেখে ‘কাল’ (কৃষ্ণ) কে স্মরণ করে সাদৃশ্যের মধ্য দিয়ে স্মরণোপমা করা হয়েছে।

রূপক

যখন উপমেয় এবং উপমানের মধ্যে কোনো “ভেদ” থাকেনা, উপরন্তু উপমেয় ও উপমানের মধ্যে “অভেদ” কল্পনা করা হয় তখনই রূপক অলংকার হয়। রূপকে উপমেয়ের ওপর উপমানের আরোপ করা হয় তারই ফলে দুটো বিজাতীয় বস্তু হলেও অভিন্ন বলে প্রতীয়মান হয়। উপমা অলংকারে উপমেয়ের প্রাধান্য, কিন্তু রূপকে উপমানের প্রাধান্য—। যদিও রূপকে উপমেয় ও উপমানে ‘অভেদ’ পরিকল্পিত হয় তথাপি এ অভেদ সর্বস্ব নয়।

রূপক অলংকারকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে—নিরঙ্গরূপক,

সাক্ষরূপক পরস্পরিত রূপক। নিরঙ্গরূপক দুটো ভাগে বিভক্ত—কেবল এবং মালা। এছাড়া রয়েছে অধিকারূঢ় বৈশিষ্ট্য রূপক।

নিরঙ্গরূপক : ‘কেবল’ : একটি উপমেয়ের ওপর যদি একটি উপমানের আরোপ করা হয়, তাহলে কেবল রূপক অলংকার হবে।

“ চিন্তানলের দাহ থেকে

কি ভাবে পাব মুক্তি ।”

উপমেয়=চিন্তা ; উপমান=অনল। এখানে ‘অনল’ প্রাধান্য পেলেও ‘চিন্তা’কে অপহব

বা গ্রাস করতে পারেন। উপমান উপমেয়কে 'গ্রাস' করে ফেলেলে হয়—“অতিশয়োক্তি” অলংকার। উপমান যদি উপমেয়কে নস্যাৎ করে ফেলে তবে হবে অহুঁত অলংকার। রূপক অলংকারে উপমেয়ের ওপর উপমানকে এমন ভাবে আরোপ করা হয় যে উপমেয় নিজের স্বরূপতাকে হারিয়ে উপমানের মতো আচরণ করে। “রূপকং রূপিতারোপো বিষয়ে নিরপহবে।” (সাহিত্যদর্পণ)।

২) “বিরহপন্থোপি পার কিয়ে পাওয়ব।”

বিদ্যাপতি।

শালা : একটি উপমেয়ের (বিষয়) ওপর বহু উপমান বা বিষয়ীর আরোপ হলে—
মালারূপক হবে।

“শীতের ওড়নী পিয়া গিরীষের বা

বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না

উপমেয়=পিয়া ; উপমান=ওড়নী, বা (বাতাস), ছত্র, না (নৌকা)।

২) “হাথক দরপণ মাথক ফুল

নয়নক অঞ্জন মূখক তাম্বুল,

হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার

দেহক সরবস গেহক সার”

বিদ্যাপতি।

৩) আমি কি তোমার উপদ্রব, অভিশাপ,

দূরদৃষ্ট, দুষ্প্রব, করলগ্ন কাঁটা ?

রবীন্দ্রনাথ।

সাক্ষরূপক

উপমেয় এবং উপমানের মধ্যে অভেদ নির্দেশ করে সঙ্গে সঙ্গে যদি তাদের অঙ্গেরও অভেদ দেখানো হয় তা'হলে সাক্ষরূপক অলংকার হবে—“অঙ্গিনো যদি সাক্ষস্য রূপনং সাক্ষমেব তৎ” সাহিত্যদর্পণ/বিশ্বনাথ।

“নন্দের নন্দন চাঁদ) পাতিয়ে রূপের ফাঁদ

ব্যাধ ছিল কদম্বের তলে।

দিয়া হাস্য স্খাচার অঙ্গছটা আঠা তার

আঁখি-পাখী তাহাতে পড়িল”

কৃষ্ণকে ব্যাধরূপে কল্পনা করে রূপক অলংকার করা হয়েছে। উপমেয়=নন্দের নন্দন—অঙ্গী, তার অঙ্গ রূপ, হাস্য, অঙ্গছটা। উপমান ব্যাধ—অঙ্গী, তার অঙ্গ

ফাঁদ, চার, আঠা। এগুলো নইলে ব্যাধের চলে না—শিকার ধরতে পারে না, কুকুও
তেমনি অঙ্গ রূপ, হাস্য, অঙ্গছটা দিয়ে 'রাধাকে' শিকার করেছেন।

২) “শংখধবল আকাশ গাঙে

শূভ্র মেঘের পালাটি মেলে

জ্যোৎস্নাতরী বেয়ে তুমি

ধরার ঘাটে কে আজ এলে?”

যতীন্দ্রমোহন।

৩) “শোকের ঝড় বহিল সভাতে

শোভিল চৌদিকে সুরসুন্দরীর রূপে

বামাকুল ; মৃদু কেশ মেঘমালা ; ঘন

নিঃশ্বাস প্রবল বায়ু ; অশ্রু বারিধারা

আসার ; জীমূতমন্ড হাহাকার রব !”

মধুসূদন।

শোকের ঝড়=রূপক, শোকের আধার=বামাকুল ও মৃদুকেশ—শোকের প্রকাশ চিহ্ন।

মৃদুকেশ, ঘন নিঃশ্বাস, অশ্রু, হাহাকার—উপমেয় অঙ্গী শোকের অঙ্গ। ঝড়ের অঙ্গ—

মেঘমালা, প্রবল বায়ু বর্ষণ (আসার), জীমূতমন্ড (মেঘ গর্জন)।

পরম্পরিত রূপক

একটি উপমেয়ে উপমানের আরোপ করা হলে যদি সেই আরোপ আর একটি
উপমেয়ে উপমানের আরোপের কারণ হয়, তা'হলে তাকে পরম্পরিত রূপক অলংকার
বলা হয়। এখানে অঙ্গের বা অঙ্গীর প্রশ্ন ওঠে না।

১) “বীর্ষসিংহ 'পরে চড়ি জগদ্ধাত্রী দয়া”

রবীন্দ্রনাথ।

দয়া=জগদ্ধাত্রী। জগদ্ধাত্রীর বাহন সিংহ, সিংহকে বীর্ষে আরোপিত করে রূপক করা
হয়েছে। ফলে সমস্তই পরম্পরিত রূপক হয়েছে।

২) ষড়ধ্যায়ের বিশ্বকাব্যে নবরসের মহামেলা মাঝখানে তার এই নিদাঘের
বীরনৌদ্রের খেলা বিশ্বকাব্যে=রূপক নিদাঘ (গ্রীষ্ম) কে বীর-নৌদ্র রস বলে রূপ
হয়েছে। প্রথম রূপকটি পরের রূপকের কারণ হওয়ায় পরম্পরিত রূপক হয়েছে।

৩) নয়নচকোর কানুমুখ শশীবর

কয়ল অমিয়রস পান।

বিদ্যাপতি।

অধিকারিত বৈশিষ্ট্য রূপক

উপমানে যখন কোনো অসম্ভব ধর্ম কল্পনা করে তাকে উপমেয়ের ওপর

আরোপ করা হয়, তা'হলে সেই রূপক অলংকারকে অধিকাররূঢ় বৈশিষ্ট্য রূপক অলংকার বলা হয়—

- ১) “ঐথর বিজরুরী বরণগোরী পেখন্দ
ঘাটের কুলে”

বিজরুরী (বিদ্যুৎ) স্থির নয়, তবুও রাধার রূপকে বলা হয়েছে—বিদ্যুৎ যেন স্থির হয়ে রয়েছে। সুতরাং উপমানে অসম্ভব ধর্ম কল্পনা করা হয়েছে।

- ২) “নাহি কাল দেশ তুমি অনিমেষ মদ্রতি
তুমি অচপল দামিনী।” রবীন্দ্রনাথ।

তুমি (মানসী বা মানস সুন্দরী)র রূপের ওপর অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে কবি বলেছেন যে চপলা দামিনী (চপলা বিদ্যুৎ) যেন অচলাল হয়ে “তুমি”র সৌন্দর্যকে বহুগুণিত করে অধিক রূপ আরোপ করা হয়েছে।

উল্লেখ

বহুগুণ থাকার জন্য একই বস্তু যদি বিভিন্ন লোকের নিকট বিভিন্ন দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় অথবা একই মানদ্ব যদি সেই বস্তুকে বিভিন্ন দৃষ্টি দিয়ে দেখে, তা'হলে উল্লেখ অলংকার হবে—

- ১) “একি মঙ্গলময়ী মদ্রতি বিকাশি
প্রভাতে দিতেছ দেখা।

রাতে প্রেয়সীর রূপ ধরি
তুমি এসেছ প্রাণেশ্বরী,
প্রাতে কখন দেবীর বেশে
তুমি সম্মুখে উদিলে হেসে—”

রবীন্দ্রনাথ।

- ২) স্নেহে তিনি রাজমাতা বীর্ষে যুবরাজ
৩) কেহবা জিহোবা, জোব, কেহ প্রভু কর।
৪) তার ফুলের মত মনটি নরম
বাজের মত কঠিন।

সন্দেহ

যেখানে উপমেয় এবং উপমানে সন্দেহ সৃষ্টি করা হয় সেখানে সন্দেহ অলংকার হয়—

- ১) চেয়ে দেখ, রাঘবেন্দ্র, শিবির বাহিরে ;
নিশীথে কি উষা আসি উতরলা হেথা ? মধুসূদন ।
- ২) দুই ধারে একি প্রাসাদের সারি ? অথবা তরুরমূল ?
অথবা, এশুধু আকাশ জুড়িয়া আমারি মনের ভুল ? রবীন্দ্রনাথ ।
- ৩) চিকুরে গরএ জলধারা
মুখশশী ভয়ে কিয় কঁাদে আঁধারিয়ারা ! বিদ্যাপতি ।
(ওটা কি রাধার কালো চুলের জলধারা ?
নয়কি (রাধার মুখ) চন্দ্রের ভয়ে ভীত
অন্ধকারের দরবিগলিত অশ্রুধারা ?

উৎপ্রেক্ষা

প্রবল সাদৃশ্যের জন্য উপমেয়কে যদি উপমান বলে মনে হয় তাহলে উৎপ্রেক্ষা অলংকার হবে ।

সন্দেহ এবং উৎপ্রেক্ষার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে—সন্দেহ অলংকারে উপমেয় ও উপমান দু'টোতেই সন্দেহ রয়েছে—কিন্তু উৎপ্রেক্ষাতে সন্দেহ দেখা দেবে—
উপমানে ।

(উপমান, রূপক, স্রাস্তিমান এবং অতিশয়োক্তির সঙ্গে উৎপ্রেক্ষার পার্থক্য হচ্ছে—ঐ অলংকারগুলোতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই । তবে অভেদ আরোপিত না হলেও সংশয়ের প্রবলতার জন্য উৎপ্রেক্ষা রূপকের ধারেকাছে এসে পেঁছায় ।

উৎপ্রেক্ষা, দূরকম—ক) বাচ্য খ) প্রতীয়মান । ক) যেখানে সম্ভাবনা (as if) সূচক শব্দের (যেন, বদ্বিধ, মনে হয়, মনে, গাঁপ, জনু প্রভৃতি) উল্লেখ থাকলে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা অলংকার হবে । খ) আর যেখানে সম্ভাবনা বাচক শব্দটি না থেকে সম্ভাবনা জাগায় সেখানেই প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা অলংকার হবে ।

- ক) ১) গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে । রবীন্দ্রনাথ ।
- ২) শয়ন পরে মেলায়ে দিয়ে তৃষিত চেয়ে রয়
এমনি করে পাইবে যেন অধিক পরিচয় । ঐ
- ৩) মনে হল, যেন পেরিয়ে এলাম
অন্তবহীন পথ । ঐ

খ) ১) লুটায় মেখলা খানি ত্যাজি কই দেশ

মৌন অপমানে ।

রবীন্দ্রনাথ ।

(এখানে 'যেন' (যেন মৌন অপমানে) কথাটি নেই) ।

২) শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে

ধ্বনিয়া তুলেছে মন্তমদির বাতাসে

শতেক যুগের গীতিকা ।

ঐ

(যেন শতেক যুগের গীতিকা) ।

৩) মৃধে নাই বাণী

দেখিলাম তার সেই মৃধ খানি

সেই দ্বার প্রান্তে লীন, স্তব্ধ, মর্মহত

মোর চারি বৎসরের কন্যাটির মত ।

ঐ

ভ্রান্তিমান

সাদৃশ্য থাকার জন্য একটি বস্তুকে অপর একটি বস্তু বলে ভ্রম হয় এবং সেই ভ্রম যদি সাধারণ না হয়ে কবি কল্পনায় চমৎকারিত্ব লাভ করে তাহলে সেই অলংকারকে ভ্রান্তিমান অলংকার বলা হয় । কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, রসজুকে সর্পভ্রম করলে তা অলংকার হবে না । কারণ এ হচ্ছে লৌকিক ভ্রম এর মধ্যে অলৌকিকত্ব নেই । আর একটি কথা মনে রাখতে হবে—যে ভ্রম করে সে কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারেই করে । উপমেয়কে উপমান বলে ভ্রম করা ইচ্ছাকৃত নয়, তা তার অজ্ঞান্বেই হয়ে যায় । এই ভুলের মূলে রয়েছে—দুটো বস্তুর মধ্যে বিশেষ কোনো সাদৃশ্য এবং সেই সাদৃশ্যবশতঃ সেই ভুল হয়ে পড়ে—

১) রাই রাই করি সখনে জপয়ে হরি

তুয়া ভাবে তরু দেই কোর ।

গোবিন্দদাস ।

(কৃষ্ণ তরুকে রাধা ভেবে আলিঙ্গন করছেন ।)

২) হরি হরি বোলি ধরনি ধরি উঠই বোলত গদগদ ভাখ

নীল গগন হেরি তোহারি ভরম ভরে বিহি সঞ্চে মাগয়ে পাখ ।

(কৃষ্ণ বিহনে রাধা ভুলদৃষ্টিত, এমন সময় নীল গগন দেখে তাকে কৃষ্ণভ্রমে উত্তোলিত হয়ে বিধি বা ভগবানের কাছে পাখা প্রার্থনা করছেন—যাতে তিনি উড়ে গিয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হতে পারেন) । উভয় দৃষ্টান্তের ভ্রমে অলৌকিকত্ব দেখা দিয়েছে ।

অপহুতি

উপমেয়কে অপহব (অস্বীকার) করে যদি উপমানের প্রতিষ্ঠা করা হয় তাহলে অপহুতি অলংকার হবে।

‘রূপক’ অলংকারে দেখা যায় যে উপমেয়ের গৌরব উপমান (অভেদ হয়ে) কিছুটা হ্রাস করে দিলে, উপমেয় ও উপমান অভেদ হয়ে পড়ে, কিন্তু অপহুতিতে উপমেয়কে অস্বীকার করে অভেদের জায়গায় ‘ভেদ’কেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

অপহুতি অলংকারে উপমেয়কে দ্ব’ভাবে নিষেধ করা হয়—১) না, নয়, নহে প্রভৃতি নিষেধাত্মক অব্যয় প্রয়োগে, ২) ছল, ব্যাজ, ছদ্ম, ছলনা প্রভৃতি সত্য-গোপন বাচক শব্দ প্রয়োগ করে। প্রথমটির ক্ষেত্রে উপমান এবং উপমেয় তাকে বিভিন্ন বাক্যে এবং দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে থাকে একই বাক্যে।

১) ক) নয় নয় ওতো আষাঢ় গগনে

জলদের গরজন

দুনিয়া যত চাপা ক্রন্দন

গদমরি উঠিছে শোন।

খ) পদ্প ও নয়, রঙীন রাগে ঝঙ্কৃত স্বপন।

কালিদাস রায়।

গ) শোভিল বীরের করে ও নহে কৃপাণ
ভুজঙ্গিনী হরি লয় অরাতির প্রাণ।

শ্যামাপদ চক্রবর্তী।

ঘ) নীরবিন্দু যত

দেখিতে কুসুমদলে, সন্ধ্যাংশুনিধি,

অভাগীর অশ্রুবিন্দু।

মধুসূদন।

—সোমের প্রতি তারার উক্তি, “নয়” কথাটি উহা থাকায় অপহুতি এখানে
“গুঢ়”।

অলংকার চন্দ্রিকা / পৃঃ ৯৩

২) ‘ছল’ শব্দ প্রয়োগে—

ক) বৃষ্টি ছলে কাঁদিল গগন।

মধুসূদন।

খ) দেবতা আশিষ ছলে বরষে শিশির।

অক্ষয়কুমার বড়াল।

গ) ওগো ললনা কত ছলনা
তব প্রেম মাঝে।

৬) ফিরে আসে রাম নয়নাভিরাম রজনী হাসিছে

জ্যোৎস্না ছলে ।

শ্যামাপদ চক্রবর্তী ।

৭) শম্ভু ধরি ছদ্ম বেশ ছলিছে উমারে ।

৮) ফাগবিন্দু দেখি সিন্দুরবিন্দু কহ

কণ্টকে কংকন দাগ মিছাই ভাব ।

চণ্ডীদাস ।

গদ় অহুতির দৃষ্টান্ত ।

কৃষ্ণ দ্বিধামা যামিনী চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে যাপন করে প্রাতে রাধার কুঞ্জে এসেছেন ; রাধা কৃষ্ণ অঙ্গে ভোগচিহ্ন দেখে অনুযোগ করলে কৃষ্ণ তার জবাব দিচ্ছেন—
ঐ লাল দাগ—সিন্দুরের দাগ নয়—ফাগবিন্দু ; ও চন্দ্রার কংকণের দাগ নয় তাড়া-
তাড়ি রাধাকুঞ্জে আসার সময় পথে কাঁটাগাছের কাঁটা লেগে ছিঁড়ে গেছে । সিন্দুর
দাগ, ও কংকণের দাগকে অস্বীকার করে সত্য গোপন করা হয়েছে ।

নিশ্চয়

উপমানকে নিষিদ্ধ করে উপমেয়কে যেখানে প্রতিষ্ঠিত করা হয় সেখানে নিশ্চয়
অলংকার হয় ।

‘অপহৃতির’ সঙ্গে ‘নিশ্চয়’ অলংকারের পার্থক্য হচ্ছে—‘নিশ্চয়’তে উপমানকে
নিষিদ্ধ করা হয় এবং ‘অপহৃতি’তে উপমেয়কে অস্বীকার করে উপমানকে প্রতিষ্ঠিত
করা । অর্থাৎ নিশ্চয়, অপহৃতির বিপরীত অলংকার ।

১) “অঙ্গে ভসম নহ, মলয়জ পঙ্ক”

বিদ্যাপতি ।

২) নয় এ মালা, নয় এ থালা, গন্ধজলের ঝারি

এষে ভীষণ তরবারি ।

রবীন্দ্রনাথ ।

৩) এ নহে মৃদুখর বনমর্মর গদ্যজিত

এষে অজাগর-গরজে সাগর ফুলিছে

এ নহে কুঞ্জ কুন্দকুসুম রঞ্জিত,

ফেন-হিল্লোল কল কল্লোলে দুলিছে ।

রবীন্দ্রনাথ ।

৪) কতিহুঁ মদন তনু দহসি হামারি

হাম নহুঁ শংকর, হেঁ বরনারী ।

বিদ্যাপতি ।

৫) “অসীম নীরদ নয়,

ওই গিরি হিমালয়” ।

বিহারীলাল ।

প্রতিবস্তুপমা, দৃষ্টান্ত, নিদর্শনা এই তিনটি অলংকারের নিজস্ব

বৈশিষ্ট্য যাই থাক না কেন—এরা উপমা অলংকারের বংশধর !

উপমা : এ এক বাক্যের অলংকার

প্রতিবস্তুপমা : দুটো স্বতন্ত্র বাক্যের অলংকার

দৃষ্টান্ত : দুটো স্বতন্ত্র বাক্যের অলংকার

নিদর্শনা : এক বাক্যের অলংকার

বস্তু=বাক্যের অর্থ ।

প্রতিবস্তুপমা (প্রতিবস্তু + উপমা) বৈশিষ্ট্য :

ক) দু'বাক্যের অলংকার । খ) উপমেয় ও উপমানের সাধারণ ধর্ম এক—কিন্তু পৃথক পৃথক বাক্যে থাকবে প্রকাশ ভঙ্গী (ভাষা) পৃথক । গ) তুলনাবাচক শব্দ থাকবে না ।

১) সৌন্দর্য তোমার মতো **বিরল** ধরায়

বৎসরে **কয়টি** রাশি লভে পূর্ণিমায় ।

শ্যামাপদ চক্রবর্তী ।

'বিরল'=কম ; কয়টি=কম । (অর্থ এক ; কিন্তু প্রকাশভঙ্গীর ভাষা পৃথক)

২) জীবন-উদ্যানে তোর যৌবন-কুসুম ভাতি

কর্তদিন রবে ?

নীরবিন্দু দ্বন্দ্বদলে নিত্য কিরে ঝলমলে ?

মধুসূদন ।

৩) লংকার বিভব যত কে পারে বর্ণিতে

কে পারে

গণিতে সাগরে রঙ্গ, নক্ষত্র আকাশে ।

ঐ

দৃষ্টান্ত

বৈশিষ্ট্য : ক) দুটো বাক্যের অলংকার । খ) উপমেয় একটি বাক্যে উপমান অপর বাক্যটিতে থাকে । গ) উপমেয় এবং উপমানের ধর্ম পৃথক । কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে ধর্মদুটো বিশ্বপ্রতিবিস্বস্বভাবাপন্ন সাধারণ ধর্মে পরিণত হবে ঘ) তুলনাবাচক শব্দ থাকবে না । (প্রতিবস্তুপমাতে সাধারণ ধর্ম এক, কিন্তু, প্রকাশ ভঙ্গীর ভাষা পৃথক এবং বস্তুপ্রতিবস্তুভাবাপন্ন ।)

১) কথাগুলো যদি বানানো হয় দোষকী

কিন্তু চমৎকার—

হীরে-বসানোর সোনার ফুল কি সত্য, তবুও কি সত্য নয়? রবীন্দ্রনাথ।

“বানানো” এবং “হীরে বসানো সোনার” যথাক্রমে “কথা” এবং “ফুলে”র সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্ম। “হীরে বসানো সোনার ফুল”—আসল ফুল নয়, কৃত্রিম; কথাগুলো “বানানো” সূত্রাং ওটাও কৃত্রিম—ভাবের দিক থেকে ঐক্য দেখা দিচ্ছে—তাই বিম্বপ্রতিবিম্ব-ভাবাপন্ন স্বীকার করতে হয়। এখানে উপমেয়—কথা উপমান—ফুল। কথাগুলো বানানো হলেও চমৎকার; সোনার ফুল সত্য না হলেও চমৎকারিষ্য রয়েছে; এখানে তুলনা বাচক শব্দ নেই।

২) অঙ্কুর তপন তাপে যব জারব

কি করব বারিদ মেহে

ইহ নবযৌবন বিফল গোঙায়ব

কি করব সো পিয়া নেহে।

বিদ্যাপতি।

৩) বনে জঙ্গলে মৃগ আছে কত

কন্তুরী মৃগ কয়টা মেলে?

মানুষ ত কত দেখিলে জীবনে

রসিক মানুষ কয়টা পেলে?

৪) অমিতা : তোমার কিছুর ক্ষতি নাই, মোরে যদি দাও

এতটুকু ভালবাসা

সমুদ্র কি রিক্ত হয়ে যাবে—আমি যদি এক

মুঠো ফেনা নিয়ে যাই?

বুদ্ধদেব বসু।

নিদর্শনা

যে অলংকারে দুটো বস্তুর ‘অসম্ভব’ বা ‘সম্ভব’ সম্বন্ধ ব্যঞ্জনাৎ বস্তুটির মধ্যে বিম্বপ্রতিবিম্বভাবাপন্ন অর্থাৎ উপমেয় ও উপমানের দ্যোতনা করে, সেই অলংকারকে নিদর্শনা বলে।

ক) নিদর্শনা এক বাক্যের অলংকার।

খ) ‘অসম্ভব’ সম্বন্ধের অর্থ হচ্ছে—যে সম্পর্ক লোকের পরিচিত নয়; এবং ‘সম্ভব’ সম্বন্ধের অর্থ হচ্ছে—যা মানুষের সংস্কারের মধ্যে বর্তমান থাকায় সহজেই স্বীকৃত হয়। (যেমন—“মেরেটি রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী।” অসম্ভব হয়েও সম্ভব

হয়েছে—যেহেতু আমাদের সংস্কারের মধ্যে এ ধারণা চলে আসছে।

গ) সম্বন্ধ সম্ভব বা অসম্ভবই হোক সূক্ষ্মদৃষ্টি দিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে তাদের মধ্যে একটা সাদৃশ্য আছে।

ঘ) অসম্ভব সৌন্দর্যের ব্যঞ্জনাই নিদর্শনার সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলে।

দৃষ্টান্ত দু'টো বাক্যের অলংকার। দৃষ্টান্তে আগে বাক্য শেষ হবে পরে তাদের ভাবসাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যাবে। কিন্তু নিদর্শনার আগে সাদৃশ্যবোধ জন্মিয়ে বাক্য শেষ হবে।

১) রাই কিশোরীর রূপগুণ হলো

আমার কিশোরী বধু।

মোহিতলাল।

অর্থাৎ আমার কিশোরী বধু যেন রাধার রূপ চূরি করে নিয়ে এসেছে। হরণ করা অসম্ভব ব্যাপার তবু তা সংস্কারে স্বীকৃত।

২) চাঁপা কোথা হতে এনেছে হরিয়া

অরুণ-কিরণ কোমল করিয়া।

রবীন্দ্রনাথ।

একই ব্যাপার।

৩) “অবরণ্যে- বরি

ফেলিন্দু শৈবালে, ভুলি কমল কানন

মধুসূদন।

সমাসোক্তি

উপমেয়ের ওপর উপমানের ব্যবহার আরোপ করা হলে সমাসোক্তি অলংকার হয়।

সমাসোক্তি অলংকারের সঙ্গে রূপকের পার্থক্য হচ্ছে—রূপকে অপ্রস্তুত (উপমান) আপন রূপের আরোপে প্রস্তুতের (উপমেয়) রূপটিকে আচ্ছন্ন করে আর সমাসোক্তিতে অপ্রস্তুত আপন রূপটি ঢেকে রেখে প্রস্তুতের ওপর শুধু নিজের ব্যবহারটুকু আরোপ করে প্রস্তুতকে দান করে মধুর বৈশিষ্ট্য। সমাসোক্তিতে প্রস্তুত বাচ্য, অপ্রস্তুতটি প্রতীয়মান। আরোপিত ব্যবহার থেকে হয় অপ্রস্তুতের প্রতীতি।

১) তটিনী চলেছে অভিসারে।

শ্যামাপদ চক্রবর্তী।

এখানে “অভিসার” কার্যটি হ'তে হচ্ছে অপ্রস্তুত নায়িকার প্রতীতি অর্থাৎ নায়িকার অভিসার-ক্রিয়াটি অচেতনা তটিনীর ওপর আরোপিত হওয়ায় মনে হচ্ছে ‘তটিনী’ সচেতনা নায়িকা।

- ২) “গেরদুয়া-বসনা সন্ধ্যা নামিল পশ্চিম মাঠ পারে” রবীন্দ্রনাথ ।
- ৩) আঁধার রজনী আসিবে এখনি মেলিয়া পাখা । ঐ
- ৪) স্বরিত পদে চলেছে গেহে
সিন্তবাস লিপ্ত দেহে
যৌবন-লাবণ্য যেন লইতে চাহে কেড়ে । ঐ
- সদ্যঃস্নাতা তরুণীর সিন্তবসনখানি দেহের ওপর এমনি ভাবে লেপ্টে গেছে—তাই দেখে মনে হচ্ছে যেন তরুণীর যৌবন-লাবণ্য কেড়ে নিতে চাচ্ছে ।
- ৫) বসুন্ধরা, দিবসের কর্ম অবসানে
দিনান্তের বেড়াটি ধরিয়া, আছে চাহি
দিগন্তের পানে । রবীন্দ্রনাথ ।
- ৬) কামিনী গন্ধে যামিনী কাঁদছে ওই
সে ত আর ফিরে এলোনা সই । অ চ.
- ৭) ওই যেথা জ্বলে সন্ধ্যার কুলে দিনের চিতা । রবীন্দ্রনাথ ।

অতিশয়োক্তি

“অতিশয়োক্তি” শব্দটির বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন বিভিন্ন আলংকারিক ।

১) আচার্য অভিনবগুপ্ত ধন্যালোকের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন—“লোকোত্তীর্ণেন রূপেণ অবস্থানম্ ইতি অয়ম্ এব অসৌ অলংকারস্য অলংকারভাবঃ ; লোকোত্তরতা এব চ অতিশয়ঃ তেন অতিশয়োক্তিঃ...” ধন্যালোক, ৩/৩৬ অর্থাৎ লোকোত্তরতাই হচ্ছে “অতিশয়”, তাই অতিশয় সাদৃশ্যের সীমায় বন্দী থাকতে পারে না ।

২) মহেশ চন্দ্র তাঁর কাব্য প্রকাশেও অতিশয় উক্তির কথা বলেছেন ।

৩) পণ্ডিতরাজ কবি জগন্নাথ (সপ্তদশ শতাব্দী) তাঁর “রসগঙ্গাধর” গ্রন্থে বলেছেন—
“বিষয়িণা বিষয়স্য নিগরনম্ অতিশয়ঃ, তস্য উক্তিঃ ।” অর্থাৎ বিষয়ীর (উপমান) দ্বারা বিষয়ের (উপমেয়) নিগরন (গ্রাস) ই হচ্ছে অতিশয় । বিষয়ীর আতিশয্য হচ্ছে অত্যাধিক কবি কল্পনা (Poetic Exaggeration) সেখানেই অতিশয়োক্তি অলংকার ।

অতিশয়োক্তি, পদূর্ণোপমা, ব্যতিরেক, রূপক, অপহৃত প্রভৃতি অলংকারগুলো একই গোষ্ঠীর সন্দেহ নেই, কিন্তু এদের মধ্যে পার্থক্যও রয়েছে । কারণ এরা হচ্ছে সাদৃশ্যমূলক অলংকার । সাদৃশ্যাত্মক অলংকারের দ্বারা পথ শূন্য হয় ‘উপমা’ অলংকার থেকে এবং উপমার চরম পরিণতি অতিশয়োক্তিতে ।

পূর্ণোপমাতে—উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম তুলনাবাচক শব্দ থাকবে।

ব্যতিরেকে—উপমেয়কে উপমানের চেয়ে উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট দেখাতে হয়।

রূপকে—উপমেয় ও উপমানকে ‘অভেদ’ পরিকল্পিত হয়, তবে অভেদ সর্বস্ব নয়।

অপহৃতি উপমেয়কে নস্যাৎ করে উপমানকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

অতিশয়োক্তি—ক্ষেত্রবিশেষে ‘উপমান’ উপমেয়কে গ্রাস করবে।

প্রতিটি অলংকারের উক্তি সাধারণ উক্তির চেয়ে বাড়িয়ে বলা হয়—অর্থাৎ অতিশয়ের স্পর্শ থাকবেই তবে অতিশয়োক্তি তা সম্ভাব্য সীমা অতিক্রান্ত করে যাবে।

অতিশয় উক্তি তে পূর্ণ—

ক) আমি নইলে মিথ্যা হ’ত সন্ধ্যা তারা ওঠা
মিথ্যা হ’ত কাননে ফুল ফোটা। রবীন্দ্রনাথ।

খ) মোর প্রিয়া হবে এসো রাণী
দেব খোঁপায় তারার ফুল।

জ্যোছনার সঙ্গে চন্দন দিয়ে

মাথাব তোমার গায়ে

রামধনু হ’তে লাল রঙটুকু দিয়ে

আলতা পড়ার পায়ে। নজরুল ইসলাম।

গ) বাঁহা বাঁহা নিকট সই তনু তনু জ্যোতি
তাঁহা তাঁহা বিজুরী চমকায় হোতি। বিদ্যাপতি।

ঘ) যতনে আনিয়া যদি ছানিয়া বিজুলি
আমিয়ার ছাঁচে যদি গড়াই পদতুলী।

রসের সাগরে যদি করাই সিনান

তবুও না হয় তোমার নিছনি সমান। বলরাম দাস।

উপমান উপমেয়কে গ্রাস করেছে :

১) “গগনেতে একই চাঁদ ইহাই মোরা জানি
ঘাটের কূলে চাঁদের গাছ কে রোপিল আনি” জ্ঞানদাস।

(চাঁদ=উপমান, উপমেয় কৃষ্ণ (কাল্যাচাঁদ) কাল। বা কৃষ্ণের উল্লেখ নেই।

২) বন্ধের নিচোলবাস যায় গড়াগড়ি
তাজিয়া যুগল স্বর্গ কঠিন পাষাণে। রবীন্দ্রনাথ।

উপমান=যদুগলস্বৰ্গ। উপমেয়=স্তনযদুগল। কিন্তু এখানে স্তনযদুগলের উল্লেখ নেই।
 স্তনযদুগলের অভাবে বক্ষের নিচোল বাস—
 গড়াগড়ি দিচ্ছে।

- ২) জানেনা সে কিসের কারণ
 নারীর অধরে হায় পান করে

কালকূট মানে না বারণ।

মোহিতলাল।

উপমান=কালকূট; উপমেয়=চুম্বন (উল্লেখ নেই, গ্রাস করেছে)।

ব্যতিরেক

উপমেয়কে উপমানের চেয়ে উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট প্রতিপন্ন করলে ব্যতিরেক
 অলংকার হবে। ব্যতিরেক ভেদ প্রধান অলংকার।

- ১) “সুধা হতে সুধাময় দ্বন্দ্ব তার”
 রবীন্দ্রনাথ।
- ২) কল কল্লোলে লাজ দিল
 নারীকণ্ঠের কাকলি—
 ঐ
- ৩) নবীনবনী নির্দিত করে
 দোহন করেছে দ্বন্দ্ব।
 ঐ
- ৪) সপ্তপদ্রুশ যথায় মানদ্রুশ
 সে মাটি সোনার বাড়ি।
 ঐ
- ৫) বিমল হেম যিনি তনু অনুপামরে।
 গোবিন্দ দাস।
- ৬) কণ্ঠস্বরে বজ্রলজ্জাহত।
 রবীন্দ্রনাথ।
- ৭) “এ পদুরীর পথমাঝে যত আছে শিলা
 কঠিন শ্যামার মতো কেহ নাহি আর।”
 ঐ

প্রতীপ

ক) উপমান যদি উপমেয়রূপে কল্পিত হয় অথবা খ) উপমেয় নিজস্ব শ্রেষ্ঠত্বগুণে
 যদি উপমানকে প্রত্যাখ্যান করে তাহলে প্রতীপ অলংকার হবে।

ব্যতিরেক ও প্রতীপের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে—ব্যতিরেক উপমেয়ের প্রাধান্য
 (উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট দেখাতে হবে) কিন্তু প্রতীপে উপমানকে প্রত্যাখ্যান করা হবে।

- ক) ১) পিল্লার হাসির মত ফুটল শতদল।
 রবীন্দ্রনাথ।

২) নির্বিড় কুন্তলসম মেঘ নামিয়াছে মম

দুইটি তীরে ।

রবীন্দ্রনাথ ।

৩) প্রভাত বেলায় হেলাভরে করে অরুণ কিরণে তুচ্ছ,

উদ্ধত যত শাখার শিখরে রডোডেনড্রন-গুচ্ছ ।

রবীন্দ্রনাথ ।

খ) “কবরী ভয়ে চামরী গিরিকন্দরে

মুখভয়ে চাঁদ আকাশে

হরিণী নয়নভয়ে স্বরভয়ে কোকিল

গতিভয়ে গজ বনবাসে ।”

বিদ্যাপতি ।

বিরোধ-মূলক অলঙ্কার

বিরোধাভাস :

যখন দুটো বস্তুকে আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী বলে মনে হলেও বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে সেখানে বিরোধ নেই, তখন বিরোধাভাস অলঙ্কার হবে। ইংরাজী Oxymoron এবং Epigram অলঙ্কারের সঙ্গে বিরোধাভাসের অনেকটা মিল রয়েছে। (The epigram is an apparent Contradiction in language which by Causing a temporary shock, rouses our attention to some important meaning underneath.)

১) অচক্ষু সর্বত্র চান অকর্ণ শূন্যতে পান

অপদ সর্বত্র গতাগতি ।

ভারতচন্দ্র ।

চোখ নেই অথচ সবই দেখছেন, কান নেই সবই শুনছেন, পা নেই তবুও হেঁটে বেড়াচ্ছেন—এ অসম্ভব কথা—কিন্তু ভগবানের পক্ষে সবই সম্ভব ।

২) মক্ষিকাও গলে নাগো পড়িলে অমৃতহুদে ।

মধুসূদন ।

হুদে পড়া এবং মক্ষিকার না গলা পরস্পর বিরোধী, তবে হুদটি সাধারণ হুদ নয়—অমৃত হুদ এই হুদ ধ্বংস করে না—অমর করে ; ফলে বিরোধের অবসান ঘটেছে ।

৩) “সবে বলে মোরে কান্দ-কলঙ্কিনী গরবে ভরল দে ।”

জ্ঞানদাস ।

কলঙ্কিত হওয়ার সঙ্গে গৌরববোধ করা পরস্পর বিরোধী—কিন্তু এ কলঙ্ক লৌকিক কলঙ্ক নয়, অলৌকিক—‘কান্দ-কলঙ্কিনী’ ।

৪) “দুহু করে দুহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া”

চণ্ডীদাস ।

- ৫) যারে এক তিল না হেরিলে শতযুগ মনে হয় । চণ্ডীদাস ।
 ৬) ফাঁসির মণ্ডে গেয়ে গেল যারা
 জীবনের জয়গান । নজরুল ইসলাম ।
 ৭) এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
 মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান । রবীন্দ্রনাথ ।
 ৮) ‘অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
 লিভি মন্দির স্বাদ’ রবীন্দ্রনাথ ।

বিভাবনা

কারণ ছাড়া কাজ হয়ে গেলে বিভাবনা অলংকার হবে । কিন্তু কারণহীন কাজ হওয়া সম্ভব নয় । আসল কথা হচ্ছে এই অলংকারে প্রসিদ্ধ কারণ থেকে কাজ হচ্ছে না এটুকু দেখিয়ে কল্পিত কারণের সহায়তা নিয়েই কার্যসিদ্ধি করা হয়, ফলে বিরোধের অবসান ঘটে । নোতুন কারণটির উল্লেখ থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে—

- ১) “বিনা মেঘে বজ্রপাত অকস্মাৎ ইন্দ্রপাত
 বিনা বাতে নিভে গেল মঙ্গল প্রদীপ ।” অমৃতলাল বসু ।
 (স্যার আশুতোষের মৃত্যুতে)
 ২) “এ ছার নাসিকা মূই যত করি বন্ধ
 তবুত দারুণ নাসা পায় শ্যাম গন্ধ ।” চণ্ডীদাস ।
 নাক বন্ধ করলে (টিপে ধরলে) গন্ধ পাওয়া যাবে না এটাই স্বাভাবিক ; কিন্তু গন্ধ পাওয়া তথাপি যাচ্ছে—ফলে কার্য-কারণের সম্পর্কবিহীন হয়েছে—বিরোধ দেখা দিয়েছে । কিন্তু অপর কারণটির উল্লেখ নেই—সেটা হচ্ছে—রাধা কান্দু প্রেমে বিভোর ।
 ৩) সে এলনা না, এল তার মধুর মিলন,
 দৃষ্টি তার ফিরে এল, কোথা সে নয়ন ?
 চুম্বন এসেছে তার, কোথা সে অধর ? রবীন্দ্রনাথ ।
 যৌবনের বসন্তকালে—কবির প্রিয়া অশরীরিণী, মিলন, দৃষ্টি, চুম্বন—সবই ভালোকে (ভাবোন্মাদে), তাই, মিলন, দৃষ্টি, চুম্বন—সম্ভব হয়েছে ।

বিশেষোক্তি

কারণ থাকা সত্ত্বেও যদি ফলের অভাব দেখা দেয় তবে বিশোষোক্তি অলংকার হবে ।

১) “যদি করি বিষপান তথাপি না যায় প্রাণ

অনল আমারে নাহি দহে ।

দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় মরণ যে বাসে ভয়

কালার যার হিয়া মাঝে রহে ।”

বিষ পান করেও মৃত্যু হ’লনা—সুতরাং কারণ থাকা সত্ত্বেও ফলের অভাব দেখা দিয়ে বিরোধের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এ ‘বিষ’ সত্যিকারের বিষ নয়—এ কাল-প্রেম—বিরহে দহন করেছে—বেদনা-বিষে জর্জরিত করেছে—তবুও মৃত্যু হচ্ছেনা। বিরোধের অবসান ঘটেছে।

২) “মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহদৈন্যে কে হয়নি নত

সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নিভাঁক,

কহ মোরে সর্বদর্শী, হে দেবীষ, তাঁর পদ্য নাম,

নারদ কহিলা ধীরে—অযোধ্যার রঘুপতি রাম ।”

রবীন্দ্রনাথ ।

(এখানে কবি নিজেই সব বিশ্লেষণ করে উত্তর দিয়েছেন) ।

৩) “দেহ দম্ব করি তার শক্তি তুমি পারনি নাশিতে

কন্দর্প ভুবন জয় করে, শম্ভু হাসিতে হাসিতে ।”

শ্যামাপদ চক্রবর্তী ।

দহন করায় শক্তিনাশ হবে, কিন্তু এখানে তা হয়নি ফলে বিরোধ অলংকার হয়েছে ।

অসঙ্গতি

কার্য ও কারণ যদি পৃথক ভাবে থেকে একটা সঙ্গতির অভাবের দ্যোতনা করে তবে অসঙ্গতি অলংকার হবে। বিরোধ অলংকারের মতো পরস্পর বিরোধী পদার্থ দু’টো থাকে একই আশ্রয়ে, কিন্তু অসঙ্গতি পৃথক আশ্রয়ে থাকে কারণ ও কার্য। এইখানে তফাৎ ।

১) “একের কপালে রহে আরের কপাল দহে

আগুনের কপালে আগুন ।”

ভারতচন্দ্র ।

শিবের কপালের নেত্রবাহিতে মদন ভস্মীভূত হয় এবং তার ফলে রতি বৈধব্য দশা প্রাপ্ত হ’লে তার কপাল পড়ল। (শিবের কপালের আগুনে)। একের=শিবের ; আরের=রতির ।

২) ওদের বনে ঝরে শ্রাবণ ধারা,

আমার বনে কদম ফুটে ওঠে ।

রবীন্দ্রনাথ ।

৩) কঠিন মাটিতে বঁধু চলে যায়

মোর বুককে ব্যথা বাজে ।

শ্যামাপদ চক্রবর্তী ।

বিষম

১) কার্য-কারণের মধ্যে যদি বৈষম্য দেখা দিয়ে বিরূপতার সৃষ্টি করে, অথবা যে ফলের আশা করা গিয়েছিল তা না হয়ে যদি অবাস্তব ফল পাওয়া যায় ২) অথবা যদি দুটো অসম্ভব ঘটনার মিলন হয় তাহলে বিষম অলংকার হবে ।

ক) ১) “সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু

অনলে পুড়িয়া গেল,

অমিয় সাগরে সিনান করিতে

সকাল গরল ভেল ।”

চণ্ডীদাস ।

খ) ১) হেরিলে ফণী পলায় তরাসে

যার দৃষ্টিপথে পড়ে কৃতান্তের দূত,—

হায়রে এ ফণী হেরি কে না চাহে এরে

বাঁধিতে গলায় ?

মধুসূদন ।

ফণী=সর্প, এ ফণী=রক্ষঃ সুন্দরীর বেণী । আসল ফণী কে গলায় জড়াবে ? কেউনা, কারণ সে যমদূত, কিন্তু ফণীরূপী বেণীকে প্রেমিক মাত্রই গলায় বাঁধতে চাইবে ।

শৃঙ্খলামূলক অলংকার

কারণ মালা

কোনো কারণের কার্য যদি পরবর্তী কোনো কার্যের কারণ হয় তাহলে কারণ মালা অলংকার হবে—

লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু ।

এই অলংকারটির সঙ্গে ইংরাজী Climax অলংকারের কিছু সাদৃশ্য রয়েছে ।

একাবলী

প্রথমে যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সেই শব্দটির পরে যে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, পরের শব্দটি যদি ঐ প্রথম শব্দটির “বিশেষণ” রূপে ব্যবহৃত হয় তাহলে একাবলী অলংকার হবে ।

১) “ছাড়ে বীণা নারদ, বীণায় ছাড়ে গীত ।”

কৃত্তিবাস ।

২) শমনদমন রাবণরাজা রাবণ-দমন রাম

শমন ভবন না হয় গমন যে লয় রামের নাম ।

সার

বক্তব্য বিষয় যদি উত্তরোত্তর উৎকর্ষলাভ করে তাহলে সার অলংকার হবে ।

“দর্শনে জাগায় আকর্ষণ, আকর্ষণ জাগায়

অনুরাগ, অনুরাগে হয় প্রেম, প্রেম ঘটায় মিলন ।”

গুণার্থপ্রতীতিমূলক অলঙ্কার

অপ্রস্তুত প্রশংসা

অপ্রাসঙ্গিক থেকে অর্থাৎ যে বিষয়টি বর্ণনীয় নয় তা থেকে প্রকাশের দ্বারা যদি বর্ণনীয় বিষয়ে বিশেষবোধ জন্মে তা’হলে অপ্রস্তুত-প্রশংসা অলংকার হবে ।

১) “নিশি যবে যায় কোন দেশে,

মলিন-বদন সবে তার সমাগমে ।”

মধুসূদন ।

২) “কুকুরের কাজ কুকুর করেছে

কামড় দিয়েছে পায়,

তা’ বলে কুকুরে কামড়ানো কিরে

মানুষের শোভা পায় ।”

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ।

অধর্মের আচরণ উত্তম অনুসরণ করে না, এটাই হচ্ছে কবির বক্তব্য এর পরই কবি অবতারণা করেছেন কুকুর ঘটিত বিশেষ ব্যাপারটির ।

৩) “অনেক মালতী আছে বাংলা দেশে—

তারা সবাই সামান্য মেয়ে,

তারা ফরাসী জার্মান জানে না,

কাঁদতে জানে ।”

রবীন্দ্রনাথ ।

জ্ঞানের মধ্য দিয়ে নারীজীবনের সার্থকতা নয়, নারীজীবনের চরম বিকাশই হচ্ছে বাংলা দেশের মালতীদের ।

অর্থান্তর ন্যাস

সামান্য বক্তব্যের দ্বারা যদি বিশেষ বক্তব্যের অথবা বিশেষের দ্বারা সামান্যের সমর্থন ঘটানো হয় তবে অর্থান্তর ন্যাস অলংকার হবে ।

- ১) “এ জগতে হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভুরি ভুরি
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।”
রবীন্দ্রনাথ।
- ২) “চিরসুখীজন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বন্ধিতে পারে !
কি যাতনা বিধে বন্ধিবে সে কিসে
কভু আশীর্বিষে দংশেনি যারে।”
- ৩) সবই যায়, কিছুই থাকে না, শব্দ করীতই থাকে,
বিক্রম গিয়াছেন কপাল কুণ্ডলা আছে।
- ৪) “মদুরলী সরল হ’য়ে বাঁকার মূখেতে রয়ে
শিখিয়াছ বাঁকার স্বভাব।”

ব্যাঙ্গস্তুতি

নিন্দার ছলে স্তুতি বা স্তুতির ছলে নিন্দা যখন বাক্যে প্রকাশিত হয় তখন তাকে ব্যাঙ্গস্তুতি অলংকার বলা হয়। এই অলংকারটি ইংরাজী অলংকার Irony সামান্য সাদৃশ্য থাকলেও Irony তে ক্রুর ভাব রয়েছে এতে তা নেই।

- ১) “কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে”
(সাগর বন্ধনকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে)।
মধুসূদন।
- ২) “অতি বড় বৃদ্ধপতি সিদ্ধিতে নিপুণ
কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন,
কুকথায় পশুগুণ ক’ঠভরা বিষ
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অর্হিণশ”
ভারতচন্দ্র।

স্বভাবোক্তি

বস্তুস্বভাবের যথাযথ এবং সুস্ক্রিয় বর্ণনাকে স্বভাবোক্তি বলা হয়। এই উক্তিভেদে চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করতেই হবে। বস্তুস্বভাবের যথাযথ বিবরণ দিলে বর্ণনা হবে, কিন্তু সৌন্দর্য সৃষ্টি হবে না। সত্যিকারের স্বভাবোক্তির সঙ্গে ঘটে সহস্র পাঠক-পাঠিকার একীকরণ—অর্থাৎ হতে হবে “চিন্তাবৃত্তি সংবাদ”।

“পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল

কাননে কুসুম করি সর্কলি ফুটিল।”

বস্তুস্বভাবের যথাযথ বর্ণনা হলে অলংকার হয়নি, বা এ ধরনের স্বাভাবিক বর্ণনা

কোনদিন “চিন্ত-চমৎকৃতি” হবে না ।

১) “কপোতদম্পতী

বাসি শান্ত অকম্পিত চম্পকের ডালে

ঘন চণ্ড-চুম্বনের অবসর কালে

নিভূতে করিতোছিল বিহবল কুজন”

রবীন্দ্রনাথ ।

বস্তুস্বভাবের স্বাভাবিক বর্ণনা হয়েও চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করার জন্যই অলংকার (স্বভাবোক্তি) হয়েছে ।

তাই আচার্য দণ্ডী অলংকারকে দুটো ভাগে বিভক্ত করে বলেছেন—

“নানাবস্থং পদাথানাং রূপং সাক্ষাদ্ বিবৃণ্বতী

স্বভাবোক্তিঞ্চ জাতিশ্চৈতাদ্যা সালংকৃতিৰ্থা”

কাব্যাদর্শ ২/৮

আলংকারিকদের মত বিশ্লেষণ করে বলা যেতে পারে যে, অলংকার বিবিধ— স্বভাবোক্তি এবং বক্রোক্তি । বক্রোক্তিকে আচার্য কুন্তক একটি নির্দিষ্ট স্থান দিয়েছেন । দণ্ডী বক্রোক্তি বলতে স্বভাবোক্তির বিপরীত অলংকার ধরে নিয়েছেন এবং স্নেহই বক্রোক্তির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে—

“শ্লেষঃ সর্বাসু পদুর্গতি প্রায়ো বক্রোক্তিষু শ্রিয়ম্

ভিন্নং দ্বিধা স্বভাবোক্তিবক্রোক্তির্শ্চৈতি বাস্ময়ম্”

স্বভাবোক্তি ও বক্রোক্তি সাধারণতঃ এক সঙ্গে মিলে মিশে থাকতে পারে না । স্বভাবোক্তি সহজ সরল এবং বক্রোক্তি ঐশ্চর্যে আড়ম্বরে গাঁবত । তবুও অনেক সময় দেখা গিয়েছে যে উভয়েই একত্রে সহবাস করছে—

১) “ছিন্দু মোরা, সুলোচনে, গোদাবরী তীরে

কপোত-কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ-চুড়ে

বাঁধি নীড়, থাকে সুখে ; ছিন্দু ঘোর বনে

নাম পঞ্চটী, মন্তে সুর-বন-সম”

মধুসূদন ।

পূর্ণোপমা অলংকার সন্দেহ নেই—স্বভাবের যথাযথ বর্ণনা থাকতে একে স্বভাবোক্তি অলংকারও বলা যেতে পারে ।

২) “পর্তাতি পত্রে বিচালিত পদ্রে

শঙ্কিত ভবদুপমানম্

জয়দেব ।

৩) “দিবস রজনী, আমি যেন কার

আশায় আশায় থাকি ।

তাই চমকিত মন, চকিত শ্রবণ

তুষিত আকুল আঁখি ।

চণ্ডীদাস ।

চঞ্চল হয়ে ঘূঁরিয়ে বেড়াই

সদা মনে হয় যদি দেখা পাই

‘কে আসিছ’ বলে চমকিয়ে চাই

কাননে ডাকিলে পাঁখি ।”

২) এবং ৩) উদাহরণে আমরা পাচ্ছি—প্রতীক্ষমানা এবং উৎকণ্ঠিতা নারী হৃদয়ের বেদনাঘন চিহ্ন । একে স্বভাবোক্তি বলা যেতে পারে ।

স্বভাবোক্তির মধ্যে সৌন্দর্য ও সূক্ষমা থাকায় আচার্য দণ্ডী একে আদি অলংকার বলেছেন । একে, যে নারীর অবয়ব গঠন নিখুঁত এবং যৌবনদীপ্তিতে দীপ্যমানা, সেই দীপ্তি—অলংকারের কোনো অপেক্ষা ঐ দীপ্তিই হচ্ছে—ঐ সূক্ষমা-মণ্ডিত নারীদেহের স্বাভাবিক অলংকার—ইহা স্বভাবোক্তি অলংকার—ইহাই ‘ধ্বনি’ । পাশ্চাত্য দেশেও এই মতবাদ স্বীকৃত হয়েছে—“Nay, the simplest truth is often so beautiful and impressive of itself, that one of the greatest proofs of his genius consist in his leaving it to stand alone, illustrated by nothing but the light of its own tears or smiles, its own wonder might, or playfulness” What is Poetry ?

আক্ষেপ

যে কথাটি বলার ইচ্ছা, সে কথাটি সোজাসুঁজি না বলে নিষেধের আভাসের মধ্য দিয়ে যদি সে কথা বলা হয় এবং তা যদি চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করতে পারে তাহলে আক্ষেপ অলংকার হবে ।

১) পিরীতিত-মদুরতি কভু না হোরিব

এ দৃষ্টি নয়ান-কোণে ।

চণ্ডীদাস ।

২) কি করব জপতপ দানরত নৈষ্ঠিক

যদি করুণা নাহি দীনে ।

সুন্দর কুলশীল ধন-জন-যৌবন

কি করব লোচনহীনে ।

চম্পতি ।

৩) মনে কি করেছ বঁধু ও হাসি এই মধু

প্রেম না দিলেও চলে শব্দ হাসি দিলে ?

রবীন্দ্রনাথ ।

বাংলায় ব্যবহৃত অপর কয়েকটি অলঙ্কার

তুল্যযোগিতা

উপমেয় (প্রস্তুত) অথবা উপমান (অপ্রস্তুত) বস্তুগুলোকে যদি একই ধর্ম বা গুণের ক্রিয়া বেঁধে রাখে তা'হলে তুল্যযোগিতা অলঙ্কার হবে।

১) “কোলে নিয়া জননীরা আপন সন্তান,

কপালে দিয়াছে ‘চুম্ব’ শিরে ‘দুঃস্বাধান’।”

গোবিন্দ দাস।

‘চুম্ব’ এবং ‘দুঃস্বাধান’ এই বস্তুদুটোকে একই সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়েছে একই ক্রিয়া “দিয়াছে” দিয়ে।

২) শৃঙ্গ “রবে” অক্ষপিতা, অক্ষপুত্র তার

আর কালান্তর যম—শৃঙ্গ পিতৃস্নেহ

আর বিধাতার অভিশাপ।”

রবীন্দ্রনাথ।

এক ‘রবে’ ক্রিয়া দিয়ে পাঁচটি প্রস্তুতকে বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

দীপক

প্রস্তুত এবং অপ্রস্তুত দু’টোকে একই ধর্মের বন্ধনে বাঁধলে দীপক অলঙ্কার হবে।

ধর্মের বন্ধন তুল্যযোগিতাতেও রয়েছে; তবে সেখানে বাঁধা পড়ে হয় প্রস্তুত না হয় অপ্রস্তুত, কিন্তু দীপকে বাঁধা পড়ে প্রস্তুত এবং অপ্রস্তুত দুটোই—

১) শক্তির আধার বটে নদী আর নারী

পিপাসাবারিণী জীবনদায়িনী।

অমৃতলাল বসু।

প্রস্তুত ‘নারী’, অপ্রস্তুত—‘নদী’—‘পিপাসাবারিণী’ আর ‘জীবন দান’ রূপ একই ধর্ম বন্ধ হয়েছে।

২) “সময় সমীর নীর, মেঘ, বৎস, নহে স্থির”।

গিরিশচন্দ্র।

প্রস্তুত—‘সময়’, অপ্রস্তুত—‘সমীর, নীর, বন্ধনকারী ধর্ম ‘নহে স্থির’।

সহোক্তি

উপমেয় উপমানের একটি প্রাধান্য দিয়ে সহার্থক শব্দযোগে যদি দুটোকে বাঁধা হয় তা'হলে সহোক্তি অলঙ্কার হবে।

১) চলে নীলশাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি

পরায় **সহিত** মোর ।

চণ্ডীদাস ।

রাধা চান করে তাঁর নীলশাড়ী নিঙাড়তে নিঙাড়তে যাচ্ছেন—কৃষ্ণ রাধাকে দেখে হৃদয়ে ঐ শাড়ী নিঙাড়ানর মতো বেদনা অনুভব করছেন । এই মোচড়ানো অর্থ নিঙড়ানো থেকে প্রতীতি হচ্ছে—‘**সহিত**’ শব্দ-যোগে ।

২) হৃদয়-স্পন্দন **সনে** ঘুরছে জগৎ

চলিছে সময় ।

অক্ষয়কুমার বড়াল ।

৩) গত বসন্তের মতো মৃতপদ্প **সাথে**

ঝরিয়া পড়িত যদি এ মোহন তন্দ্রা

আদরে মরিত তবে ।

অন্বয়

একই বস্তু যদি উপমেয় এবং উপমান হয়, তা’হলে অন্বয় অলংকার হবে ।

“তুমিই তোমার মাত্র উপমা কেবল”

গিরিশচন্দ্র ।

শ্লেষ (অর্থ)

যেখানে শব্দগুলো দুটো অর্থ প্রকাশ করে অথচ শব্দপরিবর্তনেও অলংকার অক্ষুণ্ণ থাকে, সেখানে অর্থশ্লেষ অলংকার হয়—

১) অখণ্ডমণ্ডলাকার চরাচরে ব্যাপ্ত আছে, যেবা

তাহারে দেখান যিনি, গুরু তিন কর তাঁর সেবা ।

শ্যামাপদ চক্রবর্তী ।

১) এক অর্থে ‘অখণ্ডমণ্ডলাকার’ ঈশ্বরকে যিনি দেখান, সেই গুরুর সেবা কর । ২)

আর একটি অর্থ হ’ল—যা খণ্ড নয়=গোলাকার, জগৎ যে সর্বত্র ঘুরছে (অর্থ ‘টাকা’), তাকে যিনি দেখান অর্থাৎ উপার্জনের পথ দেখিয়ে দেন, সেই গুরু (স্কুল-কলেজের অধ্যাপক), তাঁর সেবা কর ।

পরিবৃতি

দুটো বস্তুর বিনিময় হলে পরিবৃতি অলংকার হবে—

১) তুমি হেন ধন দিয়াছি যৌবন

কিনোছি বিশাখা জনে ।

চণ্ডীদাস ।

যৌবনের বিনিময়ে রাধা কৃষ্ণকে কিনেছেন ।

- ২) “কিনিলে রাঘব কুলে আজি নিজ গুণে গুণগমণি”
নিজগুণে গুণগমণি রাঘবকে কিনেছেন।

মধুসূদন।

সুখম

আকারে ইঙ্গিতে, ভঙ্গিতে স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তির বোধগম্য নয় এমন সুক্ষ্মবস্তু-
বোধে সুক্ষ্ম অলংকার হয়—

- ১) কখন মিলন হবে শূন্যানু যখন

হাসি প্রিয়া লীলাপদ্য কৈল নিমীলন।

শ্যামাপদ চক্রবর্তী।

পদ্য মৃদুদিত হয় রাঘে, দিনের বেলা থাকে উন্মীলন—সুতরাং সংকেতে প্রিয়া জানাল—
রাহিতে মিলন হবে।

- ২) সুদরজ সিন্দূর বিন্দু চাঁদনে লিখএ ইন্দু

তিথি কহি গেল তিলকে

বিপরীত অভিসার অগ্নি বরিস ধার

অঙ্কস কএল অলকে।

বিদ্যাপতি।

রাধা, কপালে সুদর্শ, চাঁদ একে পাশে চৌদ্দটি ফোঁটা (তিলক) দিয়ে সুদর্শ ও চাঁদকে
কেটে দিয়েছেন—অর্থাৎ দিনের বেলা নয়, জ্যোছনা রাঘে—কৃষ্ণ চতুর্দশী রাঘে তিনি
অভিসারে যাবেন।

ব্যাজোক্তি

কোনো গোপনীয় ব্যাপার কাজে প্রকাশ হলেও যদি ছলনা করে তাকে গোপন
করা হয় তাহলে তা ব্যাজোক্তি অলংকার হবে—

“ত’হি পুন মোতিহার টুটি কেবল

কহত হার টুটি গেল

সভজন এক এক চুণি সগরু

শ্যামদরশ ধনি কেল।”

বিদ্যাপতি।

রাধা সখি ও শাশুড়ী ননদিনীর সঙ্গে যমুনায় স্নান করে আসছেন—পথে রয়েছেন কালী-
চাঁদ। কিন্তু মৃদুস্বকল রাধা নয়নভরে কি করে দেখেন—অথচ বাকী সবাই রাধাকে
লক্ষ্য করছেন—রাধাও চোখ ফেরাতে পারছেন না, তিনি হঠাৎ বুদ্ধি করে বসে
গোপনীয় ব্যাপারটিকে গোপন রাখার জন্য—তাঁর গলার মোতির মালাটা টেনে ছিঁড়ে
ফেলে বললেন আহা মালাটি ছিঁড়ে গেল—সবাই দেখলেন সত্যিই—তাঁরা মোতি-
গুলো তুলে নিতে বসে পড়ল আর সেই ফাঁকে রাধা কৃষ্ণকে প্রাণ ভরে দেখে নিয়ে

সত্যটাকে গোপন করলেন ।

পাশ্চাত্য অলঙ্কার

বাংলা সাহিত্যে বহু পাশ্চাত্য অলঙ্কার ব্যবহৃত হয়ে আসছে । অথচ সেই ব্যবহৃত পাশ্চাত্য অলঙ্কারগুলোর বাংলা কোনো নামকরণ করা হয়নি । “অলঙ্কার-চন্দ্রিকা” গ্রন্থের প্রখ্যাতনামা লেখক শ্যামাপদ চক্রবর্তী পাশ্চাত্য অলঙ্কারের বাংলা নামকরণ তাঁর সেই গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন । আলোচ্য গ্রন্থে শ্যামাপদ চক্রবর্তীর ‘অলঙ্কার চন্দ্রিকা’ থেকে কয়েকটির উদাহরণ তুলে ধরা হল ।

Asyndeton (অত্যধিক)

সংযোজক অব্যয় ব্যবহার করা না হলে এই অলঙ্কার হবে—

“হেরিলা সুন্দরী
রথ, গজ, অশ্ব, সাদী, নিষাদী, সুদরখী
পদাতিক যমজয়ী”

মধুসূদন ।

Polysyndeton (অতিবহু)

এই অলঙ্কারটি পূর্বে অলঙ্কারের বিপরীত অলঙ্কার—

১) আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির
আর ছুতোরের—

প্রেমেন্দ্র মিত্র

Onomatopoeia (ধ্বনিবৃত্তি)

স্বর ও ব্যঞ্জননের ভাবানুকারী ধ্বনির নাম ধ্বনিবৃত্তি—

১) “গুরু গুরু মেঘ গুমরি
গরজে গগনে গগনে”

রবীন্দ্রনাথ ।

Metonymy (অনুকল্প)

১) সেক্সপীয়র বড় বেশী পড়িতাম

বঙ্কিমচন্দ্র ।

Euphemism (মঞ্জুভাষণ)

কঠিন কথাকে কোমল করে বলা—

১) বিরক্ত— “দেবদত্ত, অন্তঃপদুর নহে মন্ত্রগৃহ ।

দেবদত্ত— মহারাজ, মন্ত্রগৃহ অন্তঃপদুর নহে

তাই সেথা নৃপতির পাইনে দর্শন ।”

রবীন্দ্রনাথ ।

মন্ত্রগৃহে রাণী নেই, রাজা স্ট্রেশ, তাই কড়া কথা ঘুরিয়ে মিটি করে বলা হয়েছে ।

Innuendo (বক্ৰভাষণ)

“নিতান্তই ভদ্রলোক, অতি মিষ্টভাষী
থাকেন বিজয় কোটে, মূখে লেগে আছে
বাপদ্ বাছা, আড়চক্ষে চাহেন চৌদিকে ;
আদরে বদলান হাত ধরণীর পিঠে,
যাহাকিছু হাতে ঠেকে যত্নে লন তুলি”
লোকাটি যে ভদ্র বেশী ‘চোর’ সে কথা ঘুরিয়ে বলা হয়েছে ।

Anticlimax (Bathos—নিকৰ্ণ)

উচ্চ থেকে নীচে নেমে আসা—

“জাত গেল, ধর্ম গেল, মান গেল, পোষা শ্যালিকটা পর্যন্ত গেল ।”

শ্যামাপদ চক্রবর্তী ।

Climax (অনুলোম)

জয়সিংহ— প্রভু কারে অপমান ?

রঘুপতি— কারে ! তুমি আমি, সর্বশাস্ত্র,

সর্বদেশ, সর্বকাল, সর্বদেশ-কাল-অধিষ্ঠাত্রী

মহাকালী, সকলেরে অপমান ।”

রবীন্দ্রনাথ ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মধুসূদনের কবিমানস

“মাইকেল মধুসূদন” গ্রন্থে শ্রদ্ধেয় প্রমথনাথ বিশী বলেছেন—

“মধুর কাব্যজীবন এই দুস্তর সমুদ্রে তরঙ্গতাড়িত। তাহার এক পারে ভারতবর্ষ—
কবিগুরু, বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, আর অপর পারে হোমার, ভার্জিল, মিলটন ;
মধুর কাব্যজীবন এই দুই পারের মধ্যে নিরন্তর পারাপারে নিরত।” অধ্যাপক বিশীর
উক্তি—যথার্থ। কিন্তু ‘পারাপারের মধ্যে কোন্ পারে তাঁর কাব্যের সোনার-তরী
ভিড়িছিল—সেটাই হচ্ছে বিবেচ্য।

মধুসূদন ছিলেন হিন্দু কলেজের সেরা ছাত্র। তাঁর শিক্ষা হয়েছিল—
ডিরোজীয়, রিচার্ডসন, মাস’ম্যান প্রমুখ ইংরাজ অধ্যাপকদের অধীনে। আহা
বিহারে মধুসূদন তাঁদের অনুসরণ করেছেন ; এমনকি রিচার্ডসনের ফ্যাশনে মধুসূদন
সেলুনে গিয়ে পনের শিলিং দিয়ে চুলও ছেঁটেছেন।

বিদেশী শিক্ষকের শিক্ষা-দীক্ষার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব মধুসূদনের
প্রতিভায় “বায়রণী আগুন” ধরেছিল। তারই ফলে সাগর-দাঁড়ির দন্তকুলোদ্ভব কবি
মধুসূদন হিন্দুত্ব এবং ভারতীয়তার স্পর্শ থেকে একেবারেই মুক্ত হয়ে পড়েছিলেন
বলে বিশ্বাস অনেক সূধী সমালোচকের রয়েছে। তাঁদের এই বিশ্বাসের মধ্যে কোনো
যুক্তি রয়েছে কিনা তাই বিবেচ্য।

মধুসূদনের অন্তরে ছিল দ্বন্দ্ব—একদিকে প্রাচ্য অপরদিকে প্রাতিচ্য। নবশিক্ষায়
শিক্ষিত মধুসূদন মেতে উঠেছিলেন—বিদ্রোহী হয়ে। তিনি পন্নার ও লাচাড়ীর শৃংখল
থেকে বাংলা কবিতাকে মুক্ত করেছেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রচলন করে ছন্দোন্নতিতে
নোতুনত্বের আমদানি করেছেন। কাব্য রচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন— shall
not allow my self to be bound down by the dicta of Mr.
Viswanath of the Sahitya Darpan.”

Innuendo (বক্ৰভাষণ)

“নিতান্তই ভদ্রলোক, অতি মিস্টভাষী
থাকেন বিজয় কোটে, মূখে লেগে আছে
বাপু বাছা, আড়চক্ষে চাহেন চৌদিকে ;
আদরে বুলান হাত ধরণীর পিঠে,
যাহাকিছু হাতে ঠেকে যত্নে লন তুলি”
লোকাট যে ভদ্র বেশী ‘চোর’ সে কথা ঘুরিয়ে বলা হয়েছে ।

Anticlimax (Bathos—নিকৰ্ষ)

উচ্চ থেকে নীচে নেমে আসা—

“জাত গেল, ধর্ম গেল, মান গেল, পোষা শালিকটা পৰ্যন্ত গেল ।”

শ্যামাপদ চক্ৰবৰ্ত্তী ।

Climax (অনুলোম)

জয়সিংহ— প্রভু কারে অপমান ?

রঘুপতি— কারে ! তুমি আমি, সৰ্বশাস্ত্র,

সৰ্বদেশ, সৰ্বকাল, সৰ্বদেশ-কাল-অধিষ্ঠাত্রী

মহাকালী, সকলেরে অপমান ।”

রবীন্দ্রনাথ ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মধুসূদনের কবিমানস

“মাইকেল মধুসূদন” গ্রন্থে প্রক্বেয় প্রমথনাথ বিশী বলেছেন—

“মধুর কাব্যজীবন এই দ্বন্দ্বের সমুদ্রে তরঙ্গতাড়িত। তাহার এক পারে ভারতবর্ষ—
কবিগুরু, বাঙ্গালী, ব্যাস, কালিদাস, আর অপর পারে হোমার, ভার্জিল, মিলটন ;
মধুর কাব্যজীবন এই দুই পারের মধ্যে নিরন্তর পারাপারে নিরত।” অধ্যাপক বিশীর
উক্তি—যথার্থ। কিন্তু পারাপারের মধ্যে কোন্ পারে তাঁর কাব্যের সোনার-তরী
ভিড়োছিল—সেটাই হচ্ছে বিবেচ্য।

মধুসূদন ছিলেন হিন্দু কলেজের সেরা ছাত্র। তাঁর শিক্ষা হয়েছিল—
ডিরোজীয়, রিচার্ডসন, মাস’ম্যান প্রমুখ ইংরাজ অধ্যাপকদের অধীনে। আহা
বিহারে মধুসূদন তাঁদের অনুসরণ করেছেন ; এমনকি রিচার্ডসনের ফ্যাশনে মধুসূদন
সেলুনে গিয়ে পনের শিলিং দিয়ে চুলও ছেঁটেছেন।

বিদেশী শিক্ষকের শিক্ষা-দীক্ষার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব মধুসূদনের
প্রতিভায় “বায়রণী আগুন” ধরেছিল। তারই ফলে সাগর-দাঁড়ির দন্তকুলোদ্ভব কবি
মধুসূদন হিন্দুত্ব এবং ভারতীয়তার স্পর্শ থেকে একেবারেই মুক্ত হয়ে পড়েছিলেন
বলে বিশ্বাস অনেক সুধী সমালোচকের রয়েছে। তাঁদের এই বিশ্বাসের মধ্যে কোনো
যুক্তি রয়েছে কিনা তাই বিবেচ্য।

মধুসূদনের অন্তরে ছিল দ্বন্দ্ব—একদিকে প্রাচ্য অপরিদিকে প্রতিচ্য। নবশিক্ষায়
শিক্ষিত মধুসূদন মেতে উঠেছিলেন—বিদ্রোহী হয়ে। তিনি পয়সার ও লাচাড়ীর শৃংখল
থেকে বাংলা কবিতাকে মুক্ত করেছেন। অমিগ্রাক্ষর ছন্দ প্রচলন করে ছন্দোবধীত
নোতুনস্বের আমদানি করেছেন। কাব্য রচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—
shall not allow my self to be bound down by the dicta of Mr.
Viswanath of the Sahitya Darpan.”

মধুসূদন “বাসনা-সংস্কার” এর বিরুদ্ধাচরণ করে রাবণকে করেছেন Grand fellow এবং বিভীষণ হয়েছে দেশদ্রোহী Scoundrel । মেঘনাদ বধের দেব-দেবীর চরিত্রগুলো গ্রীক ও ইউরোপীয় সাহিত্যের জুপিটার, জুনো, জিউস প্রভৃতির কিছুটা সগোত্র হয়ে পড়েছেন । লক্ষ্মী বাহাদুরিটে গ্রীক ভাবাপন্ন হলেও লংকার সমূহ বিপদের সময় ম্লান-মুখী হয়ে পড়েছেন এবং লক্ষ্মীর ঐ মূর্তি গোড়-জনের বিজয়া-প্রভাতের চিন্তাকুলা উমা-চরিত্রের সহোদরা রূপেই প্রতিভাত হয়েছেন ।

মধুসূদন ‘মাইকেল’ হয়েও ‘মঙ্গলঘটের’ মহিমা বিস্মৃত হন নি । ব্রাহ্মণ চণ্ডালের মধ্যে যে ব্যাধান রয়েছে তাও কবি ভোলেন নি—

“কে কোথা মঙ্গলঘট ভাঙে পদাঘাতে ?”

মেঘনাদ বধ/ষষ্ঠ সর্গ ।

“চণ্ডালের পদধূলি ব্রাহ্মণের ভালে ?”

ঐ

অলংকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, মধুসূদন—হোমার, মিলটন, ভার্জিল, তাসমাকে যেমন অনুসরণ করেছেন, ঠিক তেমনি অনুসরণ করছেন—বাল্মীকি, কালিদাস, কৃত্তিবাসকে । তবুও মধু-কাব্যকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে মধুসূদন ও হোমারের মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্য রয়েছে । এ পার্থক্যটি হচ্ছে একান্তই মানসিক ।

হোমার মহাকাবি, মধুসূদনকেও অনেকেই মহাকাবি বলে অভিহিত করেছেন । মহাকাব্য মাঠেই বীররসের স্থান প্রাধান্য লাভ করে । যুদ্ধ-বিগ্রহ, শৌর্য-বীর্য, জয়-পরাজয়ের কাহিনী মহাকাব্যের প্রাণবস্তুর । বীরের সঙ্গে বীরের যেমন পার্থক্য রয়েছে ঠিক তেমনি এক মহাকাব্যের সঙ্গে আর এক মহাকাব্যের পার্থক্য আছে । দেশ, কাল, সমাজ ভেদেই এই পার্থক্য হয়ে থাকে । হোমারের মহাকাব্যের বীররসের আদর্শ উত্তরকালের মহাকাব্যের আদর্শের তুলনায় অনেকখানি আদিম ও অনার্য প্রকৃতির । বীরপূজা, বীরপ্রশান্তি ইলিয়ড-ওডেসির মর্মকথা । কিন্তু পশুত্ব ও মনুষ্যত্বের ব্যাধানটি স্বীকৃত হয়নি । ফলে এই বীর্য-শৌর্যের মধ্যে আদিম অনার্য অসংস্কৃত রূপটিই পরিস্ফুট হয়েছে বেশি । ইলিয়ড মহাকাব্যের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ইংরাজ সমালোচক Routh তাঁর God Man and Epic Poetry (পৃ-২৬) তে বলেছেন—

“The subject of the Iliod is not the Trojan War, but the wrath of Achilles”

হেক্টর এঁচিলসের চরিত্রের দুরন্তপনা, দূর্দান্ত প্রবৃত্তি-প্রভাব, রাবণ, মেঘনাদ প্রভৃতি চরিত্রে থাকলেও এঁদের আন্তরধাতু পৃথক। কারণ মধুসূদনের রাবণ, মেঘনাদ বীর হলেও প্রকৃতিতে হিংস্রতা উগ্রতা নেই। এখানে বুদ্ধির সঙ্গে বিবেকের, শৌর্যের সঙ্গে ন্যায়, ধর্ম ও নীতিবোধের সংযোগ উপেক্ষণীয় নয়। অর্থাৎ গ্রীক সাহিত্যের বীরত্ব এবং বাংলা সাহিত্যের বীরত্ব এক ধাতুতে, এক ছাঁচে গড়া নয়। রাবণ, মেঘনাদের বীরত্ব, ব্যক্তিত্ব, যুদ্ধবৃত্তি, জিগীষার অন্তরালে একটি বলিষ্ঠ মানবতা, জাতীয়তা, সামাজিকতাবোধ নিহিত। এঁদের ধ্যান-ধারণার প্রবৃত্তির সঙ্গে নিবৃত্তির যোগ রয়েছে। এঁদের ভোগও রয়েছে, ত্যাগও রয়েছে, ঔদ্ধত্যও আছে, বিনয়ও আছে। যেমনি অহংকার তেমনি অনুতাপও রয়েছে—

“কি কুক্ষণে (তোর দৃষ্টিতে দৃষ্টব্য)

পাবক শিখা-রূপিনী জানকীরে আমি

আনিব হৈম-গেহে ?”

মেঘনাদ বধ ১ম সর্গ।

হোমারের কোনো চরিত্রই এভাবে অনুশোচনা করেননি। হোমারের কাব্যে বীর-পূজার অসংস্কৃত আদর্শই রূপপরিগ্রহ করেছে। কবি বীর চরিত্রের পশুপ্রবৃত্তি জাগিয়ে তোলার জন্য সিংহ-ব্যাঘ্র প্রভৃতি দুরন্ত চরিত্রের উগ্র ও উদ্ধত রূপেই স্ফুট করেছেন—

Trojans and Greek now gather round the slain ;

তুলনীয়— “হীন-প্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী

নিভয়-হৃদয়ে যথা ফেরে দূর বনে।”

মধুসূদন/মেঘনাদ বধ।

“As when the windo with razing flames conspire

And o’er the forests roll the flood of fire.”

তুঃ— “বায়ুদল বহিলা চৌদিকে

বৈশ্বানর শ্বাসরূপে, জ্বলিল কাননে

দাবাগ্নি,”

Thus like rage of fire the Combat burns,

And now it rises, now it sinks by Turns.

তুঃ “চলিলা অঙ্গনা

আগ্নেয় তরঙ্গ যথা নিবিড় কাননে।”

মেঘনাদ বধ/৩য় সর্গ।

উপমা অলংকার সৃজনে মধুসূদন হোমারের মতই দাবাগ্নি, কালাগ্নি প্রভৃতি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু মধুসূদন গ্রীক কবির প্রতিধ্বনি হয়ে পড়েন নি কোনোদিনই। অগ্নিচরিত্রের “Ruthlessness” বা নৃশংসতার আড়ালে তাঁর শূদ্র-শূদ্র রূপটি প্রতি পদেই ফুটে উঠেছে—

“আদেশিলা অগ্নিদেবে বিবাদে দ্বিশূলী,
পবিত্র, হে সর্বশূদ্রি, তোমার পরশে
আন শীঘ্র এ সদ্ধামে রাক্ষস-দম্পতি।”

মেঘনাদ বধ/৯ম সর্গ।

মধুসূদন বলেছেন—

“As a Jolly Christian Youth, I don't care a pin's head for Hinduism, I love the grand mythology of our ancestors” তাই দেখতে পাই অলংকার প্রয়োগে মধুসূদন বাহ্যতঃ Jolly Christian Youth কিন্তু অন্তরে ভারতীয় সংস্কৃতিতে একেবারে ভরপূর—

“জননী ধেমতি
খেদান মশকবৃন্দে সুপ্ত স্নাত হতে
কর পদ্য-সংগলনে।”

মেঘনাদ বধ/৬ষ্ঠ সর্গ।

“করি স্নান সিংহনীরে, রক্ষোদল এবে
ফিরিলা লংকার পানে, আদ্র-অশ্রুনীরে—
বিসর্জ্য প্রতিমা যেন দশমী দিবসে
সপ্ত দিবানিশি লংকা কাঁদিলা বিবাদে।”

মেঘনাদ বধ/৯ম সর্গ।

মধুসূদনের কাব্যে প্রেম-প্রোচা নায়িকা সূর্যমুখীর সহোদরা এবং ধৃতুরার শূদ্ধ-সন্তা, যোগিনীর প্রতীক। এই দুই পুরুষচরিত্রের মধ্য দিয়ে হিন্দু সংস্কৃতি সম্পর্কে কবির অন্তরের সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার রূপটি প্রস্ফুটিত—

“বাহিরিলা পদব্রজে রক্ষ-কুল-রাজা,
রাবণ, বিশদবস্ত্র, বিশদ উত্তরি
ধৃতুরার মালা যেন ধূজুটির গলে।”

মেঘনাদ বধ/৯ম সর্গ।

“যথা চাহে রবিচ্ছবি পানে
স্থির আঁখি সূর্যমুখী, ও চরণে রত
এ মনঃ”

বীরাস্তনা (পদ্রুব্বার প্রতি উর্বশী)।

কর্ণিকা ফুল সম্বন্ধে কবি বলেছেন—

“হায়, কর্ণিকা অভাগা।

বরবর্ণ বৃথা যার সৌরভ বিহনে

সতীত্ব বিহনে যথা যুবতী যৌবন।”

তিলোত্তমা—১ম।

রূপমব্ধ কর্ণিকার কোনো সৌরভ নেই ; সুতরাং কর্ণিকা সতীত্ব বিহীন যুবতী নারী।
এ কল্পনা পাশ্চাত্য দেশের নয়—একান্ত ভাবেই ভারতীয়।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের ভাবধারা সম্পর্কে “To the Youth of India”
গ্রন্থে স্বামী বিবেকানন্দ (পৃ-১৫৩) বলেছেন—“The Western man is body
at first, and then has a soul ; with us a man is a soul and spirit.
and he has a body.”

কালিদাস : মধুসূদন :

পদ্য-চরিত্রের মধ্য দিয়ে কালিদাস ভারতীয় মানব চরিত্রের আভ্যন্তরীণ
রূপটিকে যেভাবে তুলে ধরেছেন, মধুসূদনও ঠিক তেমনি ভাবে তুলে ধরেছেন।
মধুসূদন সম্ভ্রানে কালিদাসকে অনুসরণ করেছেন—

ইদং কিলাব্যাজ মনোহরং বপুঃ

তপঃক্রমং সাধয়িতুং য ইচ্ছতি

ধ্রুবং স নীলোৎপলপত্রধারায়

শমীলতং ছেত্তুম্ভবির্ব্যবসতি।”

শকুন্তলা/১ম অঙ্ক।

তুঃ অমরবৃন্দ যার ভুজবলে

কারত, সে ধনুর্দ্ধারে রাঘব ভিখারী

বিধিল সম্মুখ রণে ? কলদল দিয়া

কাটিলা কি বিধাতা শালমলী তরুবরে ?

মেঘনাদ বধ/১ম সর্গ।

কালিদাসের উপমায় হাতীর স্থান অগ্রগণ্য। হাতীর শক্তির সঙ্গে হাতীর সুস্মাটুকুর
উল্লেখ তিনি যেভাবে করেছেন, মধুসূদনও অনুসরণ করেছেন—

সমমেব সমাক্রান্তং দ্বয়ং দ্বিরদগমিনা

তেন সিংহাসনং পিত্র্যনিখলগারিমন্ডলম্।

রঘু/৪/৪।

তুঃ “নব মাতঙ্গিনী-গতি চলিয়া রঙ্গিনী”

মেঘনাদ বধ/৩য় সর্গ।

“এতেক কাহিয়া দুর্গা দ্বিরদ-গামিনী

প্রবেশিলা হৈম গেহে।”

মেঘনাদ বধ/২য় সর্গ।

কালিদাসের কাব্যে 'মৃগের' আসন যেমন, মধু কাব্যেও অনুরূপ—

“মধ্যে ক্ষামা, চকিত-হরিণী প্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ” মেঘদূত/উত্তরমেঘ ।

তুঃ “গড়ুক স্বপনদেবী মায়ার পোলোমী

মৃগাঙ্গী পীবরন্তনী স্দাবিস্ব অধরা ।” তিলোত্তমাসম্ভব/১ম ।

কালিদাসের মত অর্থাস্তরন্যাস মধুসূদনও করেছেন—

“প্রতিকার বিধানমায়দুষঃ সতি শেষে হি ফলায় কল্পতে” রঘু/৮/৪০ ।

তুঃ “মাটি কাটি দংশে সপে' আয়ুহীন জনে”

মেঘনাদ বধ/৬ষ্ঠ ।

“যাণ্ডা মোঘা বরমধিগদগ্ধে নাধমে লব্ধকামা” মেঘদূত পূর্ব/৬ ।

তুঃ “অধমে, মা, অধমের গতি

ধিক যাণ্ডা—ফলবতী নীচ-কাছে ।” তিলোত্তমাসম্ভব/৪র্থ ।

কাকু বক্রোন্তি—

“ক ঈপ্সিতার্থ স্থিরনিশ্চয়ঃ মনঃ

পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ ?” কুমারসম্ভব/৫/৫ ।

তুঃ কে পারে ফিরাতে প্রবাহে ?

বিতংসে কেবা বাঁধে কেশরীরে ?

বীরাস্তনা (দশরথের প্রতি কৈকেয়ী) ।

সম্মমণী ও সম্মমণী উপমা—

শশাঙ্ক লেখামিব পশ্যতো দিবা সচেতসঃ কস্য

মনো ন দৃশ্যতে ? কুমারসম্ভব/৫/৪৮ ।

তুঃ রাহুগ্রাসে হেরি সূর্য' কার না বিদরে

হৃদয় ? মেঘদাদ বধ/৫ম সর্গ ।

কালিদাসের কাব্যে নারী চরিত্রের সঙ্গে বীণা যন্ত্রটি যেমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, মধু-কাব্যেও তাই দেখতে পাই—

“অংকমংক পরিবর্তনোচিত তস্য নিন্যাতুরশূন্যাতামুভে ।

বল্লকী চ হৃদয়ঙ্গম-স্বনা বঙ্গদ্বাগাপি চ বামলোচনা ।”

রঘু/১৯/১৩ ।

তুঃ “নীরবিলা, বিধুমুখী, নীরবে যেমতি
বীণা, ছিঁড়ে তার যদি ।”
মেঘনাদ বধ/৬ষ্ঠ সর্গ ।

কালিদাসের কাব্যে—নদীর মধ্যে গঙ্গা, পদ্মের মধ্যে পদ্ম, অগ্নির মধ্যে যজ্ঞীয়
অগ্নি বা মহাদেবে ললাটাগ্নি উল্লেখযোগ্য । মধুসূদনের মধ্যেও তাই দেখতে পাই—

“হেমীফলং হেমগিরেলতেব বিকম্বরং নাকনদীব পদম্
পদর্বে দিগ্‌নন্দনমিন্দ্রমাভাবাৎ তং পার্বতী নন্দনমাদধানা ।”

কুমারসম্ভব/১১/২৬ ।

“যথা গোমুখীর মুখ হইতে সন্মুখনে
ঝড়ে পড়ত বারিধারা, কহিলা জ্ঞানকী,
মধুরভাষিণী সতী, আদরে সম্ভাষি সরমারে ।”

মেঘনাদ বধ/৪র্থ সর্গ ।

বাল্মীকি ব্যাসদেবের অনুসরণ মধু কাব্যে থাকলেও অলংকার প্রয়োগে
মধুসূদন কালিদাস পৃষ্ঠী । তিনি নিজেই বলেছেন—“..... to read Kalidasa
and that, I think is quite enough for me.”

কালিদাস সম্পর্কে K S. Ramswami Sastri তাঁর ‘Kalidas’ শীর্ষক গ্রন্থে
“বলেছেন—In short Asia is the heart of the world, India is the heart
of Asia, and Kalidas is the heart of India.”

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক বিনয় সরকার বলেছেন—“Nobody understands Asia
who does not understand Kalidasa—the spirit of Asia ”

বাংলার ‘পাল-পার্বণ’ মধুকাব্যে বিশেষ ভাবেই চিত্রিত হয়েছে—

“বাজিছে মন্দিরবৃন্দে প্রভাতী বাজনা”

* * *

দেবদোলোৎসব বাদ্য দেবদল যবে
আবির্ভাব ভবতলে, পূজেন রমেশ !”

মেঘনাদ বধ/৬ষ্ঠ সর্গ ।

“ফিরায় বদন, ইন্দ্র-বদনা ইন্দ্রী
বসেন বিষাদে দেবী, বসেন যেমতি
বিজয়া-দশমী যবে বিরহের সাধে
প্রভাতয়ে গোড়গৃহে.....”

মেঘনাদ বধ/১ম সর্গ ।

“যেমনো রজনী আজি লয়ে তারাদলে
তুমি গেলে দিনমাণ এ পরাণ যাবে”

চতুর্দশপদী/বিজয়াদশমী ।

বাঙালি মধুসূদন : মাতৃকল্পনা :

“জননীর স্নেহ তার প্রতি সমধিক”

মেঘনাদ বধ/১ম সর্গ ।

“দেহ দেখা পুনঃ, পূজি পা দুখানি
পুত্রাই মনের সাধ লয়ে পদধূলি,
মা আমার । যবে আমি বিদায় হইনু
কত যে কাঁদিলে তুমি, স্মরিলে বিদরে
হৃদয়.....”

মেঘনাদ বধ/৫ম সর্গ ।

মহাশি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মধুসূদন সম্বন্ধে বলেছেন—“Few Hindu authors can stand near this man, and his imagination goes as far as imagination can go.”

জাতীয়তাবোধ : মধুসূদন ছিলেন জাতীয়তাবাদী কবি । তাঁর রচনায় জাতীয়তাবোধ ফুটে উঠেছে স্পষ্ট হয়ে—

“শাস্ত্রে বলে, গুণবান্ যদি

পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি

নিগূর্ণ স্বজন শ্রেয়ঃ পরঃ পরঃ সদা”

মেঘনাদ বধ/৬ষ্ঠ সর্গ ।

“জন্মভূমি রক্ষা হেতু কে ডরে মরিতে ?

যে ডরে, ভীরু সে মূঢ় ; শতধিক তারে ।”

মেঘনাদ বধ/১ম ।

জহুরী বঙ্কিম জহর চিনেছিলেন ঠিক্ । তাই তিনি বলেছিলেন—
“সুপবন বহিতেছে দেখিয়া জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও । তাহাতে নাম লেখ,
‘শ্রীমধুসূদন’ ।”

আলোচনাটি সংক্ষিপ্ত হলেও আশা করি কবি শ্রীমধুসূদনকে চেনা
কঠিন হলে পড়নি এবং আমরা আমাদের বক্তব্যকে পরিস্ফুট করতে পেরেছি । যাঁরা
বলেন সংস্কৃত সাহিত্যের কাছে মধুসূদনের ঋণ ষোল আনাই বাহিরঙ্গ তাঁদের এই উক্তি
যে কত দ্রাস্ত তা নোতুন করে বলার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করিনে । প্রখ্যাত
সমালোচক সুরেন্দ্রচন্দ্র সমাজপতি বলেছেন—

“মেঘনাদবধের ৬ষ্ঠ সর্গ বাঙ্গালীর জীবনবেদ হউক। * * * আজন্ম বিদেশী
 তন্ত্রে শিক্ষিত, বিজাতীয় ধর্মে শিক্ষিত, বিদেশের ভাষায়, চিন্তায়, ভাবে, সাহিত্যে
 অনুপ্রাণিত হইয়াও মধুসূদন স্বদেশীতন্ত্রে বিস্মৃত হন নাই। স্বদেশের ভাষায়, ভাবে
 তাঁহার শুদ্ধ অনুরাগ নয়, সহানুভূতি ও সমবেদনা ছিল। সেই সহানুভূতি ও
 সমবেদনার সংগমে দেশ-বাৎসল্যের স্বর্গীয় কহলার সহস্রদলের বিকশিত হইয়া
 উঠিয়াছিল। সেই কহলারের সৌন্দর্যে, সৌরভে বাঙ্গলার সাহিত্য ও সমাজ মাতিয়া
 উঠিয়াছিল।”

গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সূচী

সংস্কৃত

আনন্দবর্ধন—	ধন্যালোক ।
উদ্ভট—	কাব্যালংকার সারসংগ্রহ ।
কুন্তক—	বক্রোক্তিজীবিত ।
দণ্ডী—	কাব্যাদর্শ ।
ধনঞ্জয়—	দশরূপক ।
বিশ্বনাথ—	সাহিত্যদর্পণ ।
বামন—	কাব্যালংকার সূত্রবৃন্তি ।
ভামহ—	কাব্যালংকার ।

বাংলা

অতুলগদ্য—	কাব্য জিজ্ঞাসা ।
অজয় চক্রবর্তী—	সাহিত্যদর্শন ।
অমূল্যধন মদুখোপাধ্যায়—	বাংলা ছন্দের মূলসূত্র ।
আনন্দমোহন বসু—	বৈষ্ণব পদাবলীর ছন্দ ।
প্রবোধচন্দ্র সেন—	ছন্দ পরিক্রমা ।
বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য—	সাহিত্য মীমাংসা ।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—	ছন্দ ।
হরেকৃষ্ণ মদুখোপাধ্যায়—	পদাবলী পরিচয় ।
সুকুমার সেন—	ভাষার ইতিবৃত্ত ।
সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত—	কাব্যবিচার ।
সুবীর কুমার দাসগুপ্ত—	কাব্যালোক ।

মাপদ চক্রবর্তী—

অলংকার চন্দ্রিকা।

প্রসাদ ভট্টাচার্য—

মধুসূদনের কাব্যালংকার ও কবিমানস।

ইংরাজী

Aristotle—

The Poetics.

Carlyle—

The hero as Poet.

Proce. B—

Aesthetic

Junton W—

What is poetry.

Shelly—

A defence of poetry,

গ্রন্থকারের রচিত অপর গ্রন্থ

১। Literature in Kamata—Kochbihar Raj-Darbar

from 14th to 18th Century

(approved thesis for the Ph. D, Degree)

Rs—20 only.

২। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য এবং রবীন্দ্রনাথ—

(ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত)

মূল্য—৪৫ টাকা মাত্র।

৩। ভবানী মঙ্গল—রামনারায়ণ কৃত।

৪। বিজ্ঞাসুর প্রশ্নাব—ইন্দ্রকান্ত দেব শর্ম্মণ।

৫। হরির বংশের কবি ও ভবানন্দের পরিচয়।

৬। মাণিক্য মিত্রের কথা—দ্বিজ উমানাথ বিরচিত।

৭। সাধন সঙ্গীতে বাংলার মুসলমান কবি।

৮। সোনারায়ের গান।

৯। কায়্যা ও ছায়া (গল্প সংকলন)

১০। শিল্পীর মৃত্যু (ঐ)

১১। নাগেশ্বরী (উপন্যাস)

১২। পটপরিবর্তন (ঐ)

১৩। ঘুম নেই (ঐ)

১৪। মহাকাবি (নাটক)

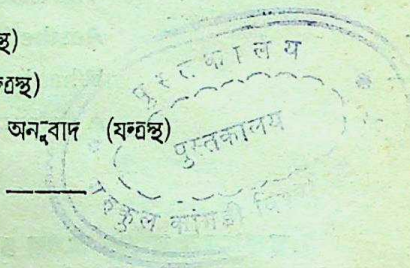


- ১৫। বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।
১৬। সাহিত্যদর্শন। (সমালোচনা)
১৭। সিরাজদ্দৌলা (গিরিশচন্দ্র) সম্পাদিত।

অসমীয়া ভাষায় লেখা

6939

- ১৮। সপ্তলিপি (গল্প সংকলন)
১৯। নাগেশ্বরী (উপন্যাস) (যন্ত্রস্থ)
২০। ছন্দ-অলংকার আব ধ্বনি (যন্ত্রস্থ)
২১। হেমসরস্বতী বিবচিত পদ্যপের অনূবাদ (যন্ত্রস্থ)



GURUKUL KANGRI LIBRARY	
Accession	
Class on	
Cat on	
Tag etc.	
Checked	
Any Other	

